অশান্ত ব্রাহ্মণ

অশান্ত ব্রাহ্মণ

সমরেন রায়



সা হি ত্য স ং স দ্‌
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ১৯৫৬

প্রকাশক :
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

মুদ্রক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড । কলিকাতা ৯

শিল্পী :
শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত
পরিবেশক :
ইণ্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোং
৬৫।২ মহাত্মা গান্ধী রোড । কলিকাতা ৯

উৎসর্গ

আমার পিতা ৺সৌরীন্দ্রনাথ রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

আমার যখন নয় বছর বয়স, ১৯২৮ সাল, আজও অস্পষ্ট মনে আছে, আমাদের বৈঠকখানা ঘরে 'এম এন· রায়' সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। সেই সময় কেন্দ্রীয় বিধান সভায় এম· এন· রায়ের 'অ্যাসেম্বলী লেটার' নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল এবং তখন ওঁরা বলাবলি করছিলেন "ও তো আমাদের হরিনাভি-কোদালিয়ার নরেন ভট্টাচার্য।"

কয়েক বছর পর, তখনও আমি স্কুলের ছাত্র, বাবার সঙ্গে আমি গাড়ীতে একদিন খিদিরপুরে যাই। সেখানে বাবা বিমলাচরণ দেব-এর সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছুক্ষণ গল্প করেন। বিমলাচরণ দেব হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী ছিলেন, যে মামলায় যতীন মুখোপাধ্যায় এবং নরেন ভট্টাচায ও আসামী ছিলেন। পরে জানতে পারি, আমার বাবা এবং যতীন মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল গভর্ণমেন্টে এক সময় সহকর্মী ছিলেন।

এই বইটি লেখার জন্য যখন আমি এম· এন· রায়ের প্রথম বৈপ্লবিক জীবনের সহযোগীদের সাক্ষাৎকার নিই তখন সতীশ চক্রবর্তী মহাশয়, ইনি তখন বেহালায় থাকেন, আমাকে বলেন যে ১৯১৫ সালে যখন ওঁরা একটি গোপনস্থান খুঁজছিলেন গুপ্তঘাঁটি করার জন্য তখন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মীয় রঞ্জিত হালদার-এর সাহায্যে বেহালার কামারপাড়া লেনে, পুরাতন মিউনিসিপাল অফিসের পিছনে একটি বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেন। বেহালায় মশার উৎপাতে কয়েকদিন পরেই অবশ্য ওঁরা ঐ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে খিদিরপুরের একটি বাড়ীতে চলে যান। এই রঞ্জিত হালদার মহাশয় বেহালা মিউনিসিপ্যালিটীর একজন কর্মচারী ছিলেন এবং আমাদের বাড়ীর সমস্ত কাজকর্মে বাবা ওঁকে খবর দিতেন এবং নিমন্ত্রণ করতেন।

আমার বাবা ইংরেজদের শাসন বরদাস্ত করতে পারতেন না, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিরও বিরোধী ছিলেন। তার একটি কারণ ছিল, গান্ধী সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন, বাবা ছিলেন সনাতনপন্থী। কিন্তু বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্কে বাবার অত্যন্ত শ্রদ্ধার ভাব ছিল। আমি যখন এম· এন· রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত, সেই সময় আমাদের বাড়ীতে একটি তিনদিনের সেমিনার (আলোচনা-সভা)-এর আয়োজন করি ভারতীয় দর্শনের

উপর। এম· এন· রায় ছিলেন ঐ সেমিনারের সভাপতি এবং প্রধান বক্তা। সেই সময় আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করি যে, "তুমি তো সনাতনপন্থী, যে জন্য তুমি গান্ধীর বিরোধী, কিন্তু এম· এন· রায় তো সমস্ত ধর্মেরই বিরোধী এবং আমি এম· এন· রায়ের সঙ্গে রাজনীতি করি। ওঁকে সভাপতি করে তিনদিনের আলোচনা-সভা করছি বাড়ীতে, তাতে তো তোমার কোন আপত্তি দেখছি না, বরং মনে হচ্ছে তুমি বেশ খুশী"। বাবা আমাকে শুধু এটুকুই বলেছিলেন ঃ "ও তো ব্রাহ্মণ, বাঘা যতীনের ডান হাত ছিল"।

সূচীপত্র

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা

যেদিন গার্ডেন রীচ ডাকাতির জন্য নরেন ভট্টাচার্য গ্রেপ্তার হন, সেদিন অত্যন্ত বিষন্নচিত্তে যতীন মুখোপাধ্যায় আমার বাড়ীতে এসে বলেন, "আমার ডান হাত ভেঙ্গে গিয়েছে।" গার্ডেন রীচের ডাকাতি পরম সাহসিকতার কাজ ছিল এবং নরেন ভট্টাচার্য অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সেটি সম্পন্ন করে। একটি গুলিও এই ডাকাতিতে ছুঁড়তে হয় নি। আমি বরাবরই ডাকাতির বিরুদ্ধে ছিলাম, বিশেষ ক'রে ভারতীয়দের বাড়ীতে ডাকাতি করার ব্যাপারে, কিন্তু গার্ডেন রীচ ডাকাতি আমি সমর্থন করেছিলুম কারণ এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একটি ইংরেজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টাকা লুঠ করা হয়।

আমরা গোপন বিপ্লবী সংস্থার লোক ছিলাম; সেকারণ আমি নরেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে সেইটুকুই বলতে পারি যেটুকুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল এবং যা আমি নিজে জানতুম। আমাদের বিপ্লবী জীবনে আমাদের অন্য কারোর ব্যাপারে বা অন্য কোন ঘটনার ব্যাপারে—যার সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম না—খোঁজ নেওয়া বা অনুসন্ধিৎসু হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। আমাদের গুপ্ত সংগঠন এবং দেশাত্মবোধের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯০৫ কিংবা ১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতির ৪৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের অফিসে। এখানে সমিতির সর্বক্ষণের কর্মীদের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং নরেন প্রায়ই ওখানে থাকতো। নরেন ও হরিকুমার চক্রবর্তী একসঙ্গেই সমিতির সভ্য হয়।

বাঙ্গালী যুবকদের শরীরচর্চার শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুশীলন সমিতি একটি প্রকাশ্য সংস্থা হিসাবে কাজ করতো এবং এর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা হতো। অনুশীলন সমিতির নেতা সতীশ বসু ও অনান্য প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ দেশকে বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। দেশকে স্বাধীন করার আদর্শে অনুপ্রাণিত করার কাজে স্বামীজী এবং ভগিনী নিবেদিতার অনুপ্রেরণা অতুলনীয়। নরেন এবং হরিকুমারও বেলুড় মঠ থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেয়।

অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম পরে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। একটি গোপন সংস্থা, অপরটি প্রকাশ্য। ব্যারিস্টার প্রমথ মিত্র সমিতিতে যোগ দেবার পর তিনিই এটি করেন এবং তাঁকে সমিতির সভাপতি করা হয়। সোদপুরের (২৪ পরগণা) বিখ্যাত সমাজ কর্মী শশীভূষণ রায়চৌধুরীই প্রমথ মিত্রকে অনুশীলন সমিতিতে আনেন। সমিতির প্রকাশ্য শাখা সমাজসেবার কাজে মনোযোগ দেয় এবং এই কাজটিও বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ থেকে নেওয়া হয়। গোপন শাখাটির প্রতিষ্ঠা করেন প্রমথ মিত্র মহাশয় এবং এটি আনন্দমঠের সন্ন্যাসীদের আদর্শ এবং ক্রিয়াপদ্ধতির থেকে এবং ফরাসী বিপ্লবীদের সংগঠন থেকে নেওয়া হয়। বিলাতে ব্যারিস্টারী পড়ার সময় প্রমথ মিত্র ফরাসী বিপ্লবীদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন।

তবে লড়াই করে নিজেদের শক্তি দিয়ে স্বাধীন হওয়ার আদর্শ প্রথম দেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পরে নিরালম্ব স্বামী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। উনিই প্রথম বরোদায় গিয়ে অস্ত্র শিক্ষা নেন যাতে বাঙ্গালীদের যুদ্ধের পরিচালনায় অস্ত্রশিক্ষা দিতে পারেন। এবং যতীন্দ্রনাথই শ্রীঅরবিন্দকে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কাজে প্রচেস্ট হন। আমরা যতীন্দ্রনাথকেই বড় নেতা বলে স্বীকার করি। ১৯০২ সালে বরোদা থেকে ফিরে যতীন্দ্রনাথ আপার সার্কুলার রোডে 'ইস্ট ক্লাব' নামে একটি শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই কেন্দ্রের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন বিশিষ্টা সদস্যা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর লাইব্রেরীতে বিপ্লব সম্পর্কিত যা বই ছিল সবই তিনি ইস্ট ক্লাবকে দিয়েছিলেন।

আমি যতদূর জানি নরেনকে আরবেলিয়ার অবিনাশ ভট্টাচার্য বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। অবিনাশ ভট্টাচার্যকে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৩ সালে ইস্ট ক্লাবে নিয়ে আসেন। পরে নরেন অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেয় এবং কিছুদিনেব মধ্যেই সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য হয়। যতীন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) এর সঙ্গে নরেন প্রথম অনুশীলন সমিতিতেই পরিচিত হয়। পরে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সময় একসঙ্গে জেলে থাকাকালীন ওদের আরও ঘনিষ্ঠতা হয়। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়কে নেতা করে একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। তখন থেকে নরেন আরও বেশী সক্রিয় হয় এবং আমাকে বহুবার যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এবং বিশ্বাস ছিল যে, আমি যদি উপযুক্ত বিপ্লবী

হই তাহলে যতীন মুখোপাধ্যায়ই আমার কাছে আসবেন। নরেন যেদিন ১৯১৫ সালে গ্রেপ্তার হয় তারপরেই সেটি হয়। সেই প্রথম যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

১৯১৪ সালে যতীন মুখোপাধ্যায়কে প্রধান নেতা করে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে' তোলার কাজে নরেনের চেষ্টাই ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে' তুলি, সেটি অনেকগুলি ছোট ছোট বিপ্লবী সংস্থার একত্রীভূত সংগঠন (Federation) হিসাবে সংগঠিত হয়। এর মধ্যে বেশীর ভাগই তখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। 'যুগান্তর' নামটি আমাদের দেওয়া নয়; তৎকালীন ব্রিটিশ অফিসাররা, বিশেষত D.I.G., C.I.D., চার্লস টেগার্ট অনবরত বলতে থাকেন: "যুগান্তর এই করেছে, যুগান্তর ঐ করেছে", তাই থেকেই যুগান্তর নামটি আমাদের সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে পূর্বেকার 'যুগান্তর' দলের একমাত্র সংযোগসূত্র ছিল এই যে, আমরা বিপ্লবী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার পর যে পত্রিকাটি প্রকাশ করি তার নাম দিই 'যুগান্তর'। এই নামটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সেজন্যই আমরা ঐ নামটি বেছে নিই। কিন্তু বারীন ঘোষ এবং তাঁর দলের চেয়েও আমাদের দেশকে স্বাধীন করার অনেক বড় এবং বিরাট পরিকল্পনা ছিল।

নরেনের এমনি শিক্ষা বেশীদূর হয় নি। এণ্ট্রান্স পাশ করেছিল মাত্র। পরে বিদেশে সে অনেক পড়াশুনা করে। আমরা তখন ধর্মবিষয়ে খুব বেশী আলোচনা করতাম না। নরেন এবং আমি খুবই বন্ধু ছিলান এবং আমরা বেশীর ভাগ সময়ই রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনা করতাম। ম্যাটসিনি (Mazzini)-র ভক্ত হিসাবে আমি ধর্ম এবং রাজনীতিকে পৃথক রেখেছিলাম। নরেনেরও ঐ মত ছিল।

রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নরেন সর্বদাই খুব ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কাজ করতো কিন্তু নিজের সহকর্মীদের সঙ্গে ওর ব্যবহার স্কুলের মাস্টার মশায়ের মত ছিল। একবার আমি নরেনকে বরিশাল দলের সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকে নিয়ে যাই। যতীন মুখোপাধ্যায় তখন বালেশ্বরে চলে গেছেন। নরেন তখন পুলিশকে লুকিয়ে খিদিরপুরের আস্তানায় আছে—১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে। সেখান থেকেই আমি নরেনকে নিয়ে যাই। নরেন আলোচনা শুরু করে। বরিশাল দলের নেতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ আমাদের প্ল্যান সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চান কিন্তু নরেন তাঁকে বরিশাল দলের যতদূর জানা উচিত বলে মনে করে তার বেশী বলতে রাজী হয় না। বরিশাল দলকে

আমাদের সঙ্গে টানাই এই গোপন বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নরেন বিস্তারিত প্ল্যান জানাতে রাজী না হওয়ায় আমাদের আলোচনা প্রায় ভেঙ্গে যেতে বসে। তখন আমি নরেনকে তার গোপন আড্ডায় ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এবং পরে আমি নিজেই বরিশাল দলের সঙ্গে আলোচনা চালাই। বরিশাল দল তারপর আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

১৯১৫ সালের শেষার্ধে নরেন যখন দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়ায় যায় তখন ও বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা গোলমাল হবে। ওর সঙ্গে ফণী চক্রবর্তীকে নিয়ে গিয়েছিল সহকারী হিসাবে। এই দ্বিতীয় সফর থেকে নরেন বহুদিন পর্যন্ত আর ফেরেনি। আমাকে ও প্রথম চিঠি লেখে মস্কো থেকে ১৯২০ সালের পর। ১৯১৬ সালে নরেন আমেরিকা পেঁছে প্রথম আমার ভাই ধন-গোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকে। ধনগোপালকে আগে থাকতেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল যে নরেন দেশে ফিরতে না পারলে আমেরিকা গিয়ে ওর কাছে উঠবে। সেইমত ধনগোপাল বন্দোবস্ত করে রেখেছিল।

বৈপ্লবিক আন্দোলনে নরেন নিশ্চিতভাবে একজন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় (colourful) ব্যক্তিত্বের নেতা ছিল এবং নরেনের সাংগঠনিক দক্ষতাও ছিল অদ্ভুত। যতীন মুখোপাধ্যায় নরেনের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন এবং নরেনকেই তাঁর অধীনে দ্বিতীয় নেতা হিসাবে গণ্য করতেন। (কমিউনিস্ট নেতা) মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্বন্ধে জনসাধারণ অনেক কিছু জানেন এবং শুনেছেন কিন্তু আমাদের কাছে নরেন ভট্টাচার্য একটি অত্যন্ত প্রিয় এবং স্মরণীয় নাম। রাজনীতির এখনকার ছাত্রদের সেই সময়কার বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের নেতাদের বিষয়, যা এখন ইতিহাসে পরিণত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা উচিত।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

পটভূমি

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই ভারতীয় সমাজ এক বিরাট হতাশা ও নৈতিক অবনতির মধ্যে ডুবে ছিল। ধ্বংসোন্মুখ মোগল রাজত্বের অনাচার, অপদার্থতা এবং রাজদরবারের চক্রান্ত শুধু মোগল সাম্রাজ্যেরই ধ্বংস ঘটায়নি সাধারণ মানুষের জীবনকেও দুর্বিসহ করে তুলেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবি চন্দ্রাবতী তাঁর 'কেনারাম' নামক গাথায় এই সময়ের একটি প্রকৃষ্ট ছবি তুলে ধরেন। রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেশকে অরাজকতায় ডুবিয়ে দিয়েছে মানুষ ঘর-বাড়ী ছেড়ে পলাতক এবং প্রশাসনিক বিশৃংখলা মানুষকে কিভাবে ভীত-গ্রস্ত করেছে কবি চন্দ্রাবতী ঐ গাথায় তা ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুতপক্ষে ১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ রাজত্বকাল মোগল সাম্রাজ্যের একদিকে যেমন শীর্ষ পরিণতি আবার তার ধ্বংসেরও সূত্রপাত। আওরঙ্গজেবের প্রায় কোন উত্তরাধিকারীরই চারিত্রিক ও নৈতিক মান প্রশংসনীয় ছিল না এবং কারুরই প্রশাসনিক জ্ঞান বা দূরদৃষ্টি ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অবস্থায় ইংরাজ বণিক এদেশে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে। পলাশীর যুদ্ধ (১৭৫৭) সম্পর্কে লর্ড ক্লাইভ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ যত হাজার হাজার দর্শক পলাশীর মাঠের চারিদিকে দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধ দেখছিল তারা যদি প্রত্যেকে একটি করে ইঁটও ছুঁড়তো তাহলেও আমরা হেরে যেতুম। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় সাধারণ মানুষ যে অনাচার ও প্রশাসনিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিল তারই নিদর্শন সাধারণ মানুষের এই নিষ্ক্রিয়তা।

ইংরেজদের এ দেশে আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে যে নূতন যোগসূত্র স্থাপিত হয় সেই যোগাযোগ অবশ্য ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার করে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। ইংরাজরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন ইংলন্ডে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে এবং সারা ইউরোপের সমাজ-জীবনে এবং চিন্তা-জগতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। ইংরেজদের আসার পরে পরেই এবং ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত বাংলাদেশে নূতন নূতন কর্ম-সংস্থানের এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দরজা খুলে যায়, ফলে এক নূতন

সমাজ-চেতনার সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার এই নূতন পরিস্থিতির বর্ণনা করে লেখেন।

"আমাদের নৈরাশ্যজনক ক্ষয়িষ্ণু সমাজে ইউরোপের যুক্তিশীল প্রগতি শক্তি প্রচন্ডভাবে আঘাত হানে। প্রথমত, শান্তি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য দেশে একটি সৎ এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্টা হয়। তারপর এক-যুগের মধ্যেই মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকদের অত্যাচার থেকে দেশ উদ্ধার পেতে থাকে ...যেন ঈশ্বর প্রেরিত এক যাদুকরের যাদুকাঠির স্পর্শে স্থিতিশীল এক প্রাচ্য সমাজের শুকনো হাড়গুলো আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো। কনস্টান্টি-নোপ্‌লের পতনের পর ইউরোপে যে নবজাগরণ হয়, তার চেয়েও ব্যাপক, গভীর এবং বৈপ্লবিক ছিল এই পরিবর্তন'।[১]

['In our hopelessly decadant society the rational progressive Spirit of Europe struck with irresistible force. First of all, an honest and efficient administratlon was imposed on the country ...to ensure peace and economic growth. Then, within one generation, the land began to recover from the plight of medieval theocratic rule...The dry bones of a stationary, oriental society began to stir under the wand of a heaven-sent magician. It was truly a renaissance, wider, deeper and more revolutionary than that of Europe after the fall of Constantinople."]

ইংরাজরা এদেশে আসার পর এবং বিশেষ করে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে এদেশের মানুষের জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়, মানুষ নতুনভাবে চিন্তা শুরু করে, এবং এক নতুন সমাজ চেতনার উদ্ভব হয়। আমাদের তদানীন্তন নিশ্চল সমাজের অনগ্রসরতা এবং প্রগতির প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ এবং কারণ কিছু কিছু মানুষ উপলব্ধি করে, এবং সেই সব পূর্বসূরীরা সমাজকে সব রকম অন্ধবিশ্বাস, গতানুগতিকতাব বন্ধন এবং গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করতে প্রয়াসী হন। এর থেকেই সমাজের এক নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয় এবং ইংরাজরা আসার ফলে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার যে নতুন পথ খুলে যায়, সেই সুযোগ সমাজে নতুন বিপ্লব আনার কাজে সহায়ক হয়। কিছু মানুষ পুরাতন জরাজীর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করে' নতুন ও স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কর্মের সুযোগ পায়। ফলে

(১) স্যার যদুনাথ সরকার Fall of the Mughal Empire (মুগল সাম্রাজ্যের পতন), Vol. IV

নতুন সমাজ-চেতনা ও নতুন চিন্তাধারা আমাদের জরাজীর্ণ ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে উদ্যত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রথম আমাদের জরাজীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠেন এবং পুরাতন জীর্ণ সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মান্ধতার গোঁড়ামি এবং বদ্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) সর্বপ্রথম এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এবং নতুন সমাজ চিন্তা ও চেতনার প্রবক্তা হিসাবে এক নতুন সমাজ ও ধর্মের কথা প্রচার করেন, এবং পুরাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাস ও নিরর্থক যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর নূতন "ব্রাহ্ম" ধর্ম তিনি উপনিষদের দর্শন ও চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠা করেন—যা ভারতেরই নিজস্ব এবং যা গোঁড়ামি ও জরাজীর্ণ সমাজের ধ্বংসের স্তূপে চাপা পড়েছিল। তাঁর এই আন্দোলন ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজের উষ্মার কারণ হয়। প্রাচীনপন্থী হিন্দুরা—যাঁরা গোঁড়ামি ও সংস্কারে অন্ধবিশ্বাসী এবং কোন রকম পরিবর্তনকে ভয় করতেন তাঁরা এর ঘোর বিরুদ্ধতা করেন। কিন্তু রামমোহনের এই আন্দোলন এক নূতন যুগ ও চেতনার সৃষ্টি করে;—এবং তারই ফলস্বরূপ "নব্য বাংলা" (Young Bengal) আন্দোলন শুরু হয়—গোঁড়ামির বিরুদ্ধে, এবং মৃতপ্রায় সমাজে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে।[২]

নূতন ও প্রাচীনের যে সংঘাত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে শুরু হয় রামমোহনের আন্দোলনের ফলে, তার দ্বারা বাংলাদেশেই প্রথম এক নব জাগরণ দেখা দেয় এবং নূতন ও প্রাচীনপন্থীদের সংঘর্ষ সমাজকে দুই দিক থেকেই সঞ্জীবিত করে তোলে। নূতনের বলিষ্ঠ প্রবক্তাদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে থেকেও আরও উপযুক্ত এবং শিক্ষিত মানুষরা এগিয়ে আসেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই এই সংঘাত বাংলার শিক্ষা এবং

(২) রামমোহন রায় সম্বন্ধে বাংলার অগ্নিযুগের স্বনামধন্য বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন—"বাংলায় ইংরাজী শিক্ষার জন্মদাতা, সহমরণ প্রথার উচ্ছেদকারী এই বেদান্ত-কেশরী রামমোহন ইংরাজ আমলে ভারতে স্বাধীনতার প্রথম অগ্রদূত। সে যুগে তিনি অতুলনীয়— সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর উপাসক যুগপুরুষরূপে উদিত। রামমোহনের কথা বলছি, কারণ চিন্তা করলে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, যে পূর্ণ স্বাধীনতার স্পৃহার জন্ম ১৮০০ সালের গোড়ায় এই যুগপুরুষের তেজস্বী, মনে, প্রাণে ও একক প্রচেষ্টায়।" (অগ্নিযুগ; পৃঃ ১০৭)।

সমাজ চিন্তায় এক নতুন জাগরণ এনে দেয়। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ভারতের ইতিহাসের এক স্বর্ণযুগ।

একদিকে রামমোহন, অন্যদিকে রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। ভারতের বিস্মৃত-প্রায় ধর্ম, দর্শন ও ইতিহাসের অনেক কিছু এই দ্বন্দ্বের ফলে উদ্ধার হয়। উপনিষদ, বেদ থেকে শুরু করে স্মৃতি, মহাভারত, পুরাণ, প্রাচীন কাব্য ও দর্শন গ্রন্থের এক বিরাট উদ্ধার কার্য শুরু হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে দু'পক্ষই ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য চিন্তার জগৎকেও অনুধাবন করতে প্রবৃত্ত হন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই জন স্টুয়ার্ট মিল, বেকন, টমাস পেইন প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীর লেখা কলকাতায় বিশেষ সমাদৃত হয়। টমাস পেইনের 'The Rights of man' তৎকালীন কলকাতায় কালোবাজারে বিক্রী হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আর একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান 'নব্য বাংলার' সমর্থকদের দেখিয়ে দেন যে, প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারা এবং দর্শন শুধু গোঁড়ামি ও মন্ত্র-তন্ত্রেই সীমিত ছিল না। এই ব্রাহ্মণ-সন্তান পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) হিন্দু সমাজে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন এবং শিক্ষার জগতে এক নতুন আলোড়ন এনে দেন। বিদ্যাসাগর সমস্ত হিন্দু সমাজকেই নাড়া দেন এবং প্রাচীন চিন্তা ও লেখনী উদ্ধার করে অন্ধ গোঁড়ামিকে ভেঙ্গে চুরে ভারতের প্রাচীন মৌলিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার করেন, এবং সংস্কৃত ও প্রাচীন শাস্ত্রীয় শিক্ষার এক নবযুগ প্রবর্তন করেন। ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজে তিনি এক নূতন আলোড়ন আনেন এবং সংস্কৃত ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার এক নূতন যুগ সৃষ্টি করে' তিনি শিক্ষাকে গ্রামাঞ্চলে এবং মহিলাদের মধ্যে প্রচলন করেন। তাঁর এই শিক্ষা-বিস্তার এবং গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আন্দোলন বাংলাদেশে এমন এক চিন্তা-বিপ্লব আনে যে ১৮৫৭ সালে যখন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সিপাই বিদ্রোহ শুরু হয় তখন বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ সে সম্পর্কে বিশেষ মাথা তো ঘামায়ই-নি বরঞ্চ সমস্ত ব্যাপার-টাকেই প্রায় এড়িয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বিদ্রোহের সময় কলেজ-প্রাঙ্গণে ইংরাজ সৈন্যদের থাকবার ব্যবস্থা করেন। বাংলার মানুষ তখন চিন্তা ও শিক্ষার অন্য স্তরে বিশেষভাবে লিপ্ত। যদিচ, এক শ্রেণীর গোঁড়া হিন্দু সিপাই বিদ্রোহকে বিদ্যাসাগরের বিধবা-আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও বর্ণনা করেন।

বিদ্যাসাগরের এই শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আলোড়নের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন। মধুসূদনের

১৮৬১ সালে রচিত এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিশিষ্ট কবিতা "আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়" বাংলাদেশের দেশাত্মবোধের এবং নতুন সাংস্কৃতিক চেতনার ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় প্রবর্তন করে। দেশাত্ম-বোধের এবং জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে মাইকেলের এই কবিতার অবদান অতুলনীয়, এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আলোড়নের দ্বারা বিদ্যাসাগর এই নতুন দেশাত্মবোধের প্রবর্তক।

এই অঙ্কুর থেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। স্যার উইলিয়ম জোনস্, ম্যাকস্ মুলার, কোলব্রুক, উইলসন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি দেশীয় এবং বিদেশীয় পন্ডিতগণের প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা এক নতুন চেতনা এবং গর্বের সৃষ্টি করে।

"ভারতবর্ষে রাজনৈতিক গন্ডগোল" (পলিটিকাল ট্রাবল ইন ইন্ডিয়া, ১৯০৭-১৯১৭) গ্রন্থের ভূমিকায় সি, আর, ক্লিভল্যান্ড, তৎকালীন বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের পরিচালক, লিখেছেন ঃ

"ভারতের মহিমাকীর্তন এবং পাশ্চাত্যের প্রতি হেয় ভাব নৈরাজ্যবাদকে প্রভাবিত করে। দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা সকলেই— অত্যন্ত উম্মত্তভাবে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতার প্রশংসা এবং খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সমাজের নিন্দা প্রচার করেন। এঁরা সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন যে ভারতের সবকিছুই খাঁটি, উন্নত, আধ্যাত্মিক, আর পাশ্চাত্যের সবকিছুই জড়বাদী, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ এবং মন্দ। এর পেছনে এসব নেতাদের কোন ক্ষতিকর উদ্দেশ্য ছিল বলে' আমি বিশ্বাস করি না। স্যার ভ্যালেন্টাইন চিরোল অবশ্য এ ব্যাপারে সুদূর প্রসারী জের টেনেছিলেন। তাঁরা তাঁদের অনুগামীদের উদ্যমী এবং হিন্দুত্বে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, সেই সব অনুগামিদের ভারতের স্বার্থে কঠোর পরিশ্রমের ব্রতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সুতরাং সাধারণ হিন্দু যদি এই যুক্তি ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয় যে হিন্দুধর্ম এবং ভারতীয় সভ্যতা নির্ভেজাল, আধ্যাত্মিক ও সৎ আর খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা স্থূল অর্থে জড়বাদী এবং কলুষিত তাহলে সাধারণ হিন্দুদের এ-ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারত যত শীঘ্র ইউরোপ ও পশ্চিমী দুনিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হবে তত-ই তার মঙ্গল"।

১৮৫৮ সালেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় পন্ডিত দ্বারকানাথ

বিদ্যাভূষণ[৩] সোমপ্রকাশ নামে একটি বাংলা পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। বিদ্যাসাগরই এই পত্রিকা প্রকাশনে মূল অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দেন। 'সোমপ্রকাশ' জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রথম মৌলিক উপাদান যোগায়।

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী চেতনার দ্বারা মানুষকে দেশের সরকারের পরিচালনার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করতে আরও প্রায় ১০ বৎসর সময় লাগে। বিদেশী সরকার যে দেশের মানুষের মুক্তি ও বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দেয় না বা দিতে পারে না, এবং সেজন্য দেশের লোককে সরকারের পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত করার প্রয়োজন— এই চেতনার সৃষ্টি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। এই নবচেতনাকে আন্দোলনের রূপ দেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৬)। ইংরাজ সরকার কর্তৃক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আই, সি, এস, হইতে অপসারণ এবং হাইকোর্টে তাঁকে ব্যারিস্টার হিসাবে ওকালতি করতে বাধা সৃষ্টি করার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথই প্রথম বিদেশী সরকারের অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে এবং দেশের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করেন।

১৮৭৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বাংলার ছাত্র-সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত করার জন্য ছাত্র সংগঠন করেন। এটিই প্রথম রাজনৈতিক ছাত্র-সংগঠন। পরের বছরই, ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তিনি 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংগঠন হিসাবে। ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন।

পরবর্তীকালে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুই ধারায় বিভক্ত হয়ঃ একদল— যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত এবং নিয়মানুবর্তিতার সমর্থক, তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করে' দেশের সরকারের পরিচালনার সঙ্গে ভারতীয়দের সংযুক্তির জন্য প্রচেষ্ট হন। তাঁরা ভারতে ইংরাজদের রাজত্ব দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং সভ্যতার পথনির্দেশক বলে মনে করেন।

অপরপক্ষে অন্য মতানুবর্তীরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেন। এঁরা পুরাপুরি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার সমর্থক। এই মতধারার নেতা রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) এবং শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ১৮৬১ সালে একটি গোপন বিপ্লবী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং "Society for the Promotion of National Feeling"

(৩) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়ীপোতার লোক ছিলেন এবং মানবেন্দ্রনাথের দাদামশাই পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর খুল্লতাত।

(জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনী সংস্থা) নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। পরে ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসু পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং হিন্দু-সভ্যতার পক্ষে আন্দোলন করার উদ্দেশ্যেই ঐ জাতীয়তা-বোধ উজ্জীবনী সংস্থাটি প্রকাশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণায় নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ সালে একটি "জাতীয় মেলা"-র উদ্বোধন করেন। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ চেতনার উন্মেষণ।

পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদকে এক নূতন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, এতদিন ধরে যা জাতীয়তাবাদ হিসাবে প্রচলিত হয়ে এসেছে তা বিদেশ থেকে ভারতবর্ষে আনা পরগাছা (an exotic plant transplanted to the Indian soil from Europe)[৪]। তাঁর বিখ্যাত রচনা, কমলাকান্তের দপ্তর-এ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গভূমিকে দুর্গার সঙ্গে সমভাবে তুলে ধরেন এবং মাতৃভূমিকে মা এবং দুর্গারূপে বর্ণনা করেন। মাতৃভূমির একটি প্রকৃষ্ট প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যেই তিনি 'বন্দে মাতরম্' কবিতাটি রচনা করেন ১৮৭৫ সালে, এবং পরে ১৮৮২ সালে ঐ কবিতাটি আনন্দমঠে সংযোজন করেন। 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে মন্তব্য করে' বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন ঃ 'বন্দে মাতরম্' অনুপ্রাণিত জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র সাংগঠনিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আদর্শ নয়, বন্দে মাতরম্ ভারতবর্ষের নতুন ধর্ম, নতুন জীবনাদর্শ।[৫]

(৪) Biman Behari Majumder—History of Political Thought, Bengal ; P. 413.

(৫) বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের একজন নেত্রীস্থানীয়া এবং রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী, সরলা দেবী চৌধুরাণী "জীবনের ঝরাপাতা" পুস্তকে লিখেছেন ঃ
"বঙ্কিমের স্মৃতি প্রসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' গান ও মন্ত্রের স্মৃতি ভেসে না উঠে যায় না। . . . রবীন্দ্রনাথই 'বন্দেমাতরম্' এর প্রথম সুর বসিয়েছিলেন। . . . একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন—'তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল্‌না। . . . তাঁর আদেশে 'সপ্তকোটি কণ্ঠ করকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে এবং গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর ফুটিয়ে নিলুম। . . . সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে লাগলো। . . . সেই থেকে সারা বাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়লো— বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গবর্ণর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হলো আহিমালয়—কুমারিকা পর্যন্ত ঐ বোলটি ধরে নিল" (পৃঃ ৪৭-৪৮)।

১৭৭২-৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অবলম্বন করে' বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লেখেন। সন্ন্যাসী নেতা ভবানন্দ তাঁর দলের নতুন সভ্য মহেন্দ্রকে জাতীয়তাবাদের নতুন মন্ত্র ব্যাখ্যা করে বলেন: এই নূতন দল দেশমাতৃকা ছাড়া আর কাহাকেও মা বলে' স্বীকার করে না। আনন্দমঠে সন্ন্যাসীদের 'সন্তান' আখ্যা দেওয়া হয়—দেশমাতার সন্তান। এবং দেশমাতাকে তিন দেবীর রূপে প্রকাশ করা হয়,—জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গা।

তারপর মহেন্দ্রকে আনন্দমঠের তিনটি মন্দিরে নিয়ে যান মঠের প্রধান সন্ন্যাসী সত্যানন্দ। প্রথমে মহেন্দ্রকে জগদ্ধাত্রীর সামনে এনে অনুধাবন করতে বলা হয়: ইনি হচ্ছেন মা যা ছিলেন। এরপর মহেন্দ্রকে একটি অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি ভয়ঙ্কর মূর্তির সামনে দাঁড় করানো হয়। সত্যানন্দ বলেন: ইনি হচ্ছেন মা এখন যা হয়েছেন। এবং সর্বশেষ মন্দিরে তাঁকে এক দেবী মূর্তির সামনে আনা হয়। তাঁর একপাশে লক্ষ্মী, অন্যপাশে সরস্বতী; এবং লক্ষ্মী-সরস্বতী অপেক্ষা অধিক সৌন্দর্য ও দীপ্তিময়ী—যাঁর কাছে সমস্ত মানুষ অঞ্জলি দিচ্ছে—সেই দুর্গাকে দেখিয়ে বলা হয়: ইনি মা যা হবেন। দুর্গা দর্শনে অভিভূত হয়ে মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করে: কবে আমরা এই মা'র দর্শন পাবো? সত্যানন্দ বলেন: যখন তাঁর সমস্ত সন্তান তাঁকে মা বলে' ডাকতে পারবে। তারপর মহেন্দ্র দুর্গামূর্তির সামনে সন্তানদলের প্রতিশ্রুতি (vow) পাঠ করে: "সংসার এবং অর্থ পরিত্যাগ করবো, কোনরূপ মোহের আসক্ত হবো না, কোনরূপ স্ত্রীসঙ্গ করবো না, সত্য ও ধর্মের জন্য সংগ্রাম করবো এবং এক মায়ের সন্তান হিসাবে জাতিভেদ ভুলিব।" তারপর সবাই সমস্বরে গান করেন—বন্দে মাতরম্।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রথম গোপন বিপ্লবী সংস্থা "অনুশীলন সমিতি"-র সভ্যদের এইরকম প্রতিশ্রুতি নিতে হত। 'অগ্নিযুগ'-এর প্রথম খণ্ডে বারীন ঘোষ লিখেছেন: "অরবিন্দ নিজে আমার হাতে কোষমুক্ত অসি ও গীতা দিয়ে একটি কাগজে সংস্কৃতভাষায় লেখা দীক্ষাপত্র পাঠ করিয়ে শপথ করান। তার মর্ম হচ্ছে,—'দেহে যতদিন জীবন আছে ও যতদিন বিদেশীর দেওয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ভারতের মুক্তি না ঘটে—ততদিন এই বিপ্লব-ব্রত পালন করে' যাব। যদি কখন এই গুপ্ত সমিতির কোন কথা বা ঘটনা প্রকাশ করি বা সমিতির অনিষ্ট করি তা'হলে চক্রের গুপ্তঘাতকের হাতে আমার প্রাণ যাবে।" (পৃঃ ৩৯)।

বঙ্কিমচন্দ্র কালীর এক নূতন সংজ্ঞা দেন। তাঁর মতে কালী ভারতবর্ষের

ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার পরিচায়ক। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ দেশের দৈন্যের পরিচায়ক। তাঁর নগ্নমূর্তির কারণ দেশ তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য হারিয়েছে। তাঁর গলায় নরমুন্ডমালা—কারণ দেশ এক বিরাট শ্মশানে পরিণত হয়েছে। শিব তাঁর পদপিষ্ট কারণ ভারতবাসীরা নিজেরাই তাদের সমাজ ও সমৃদ্ধিকে পদদলিত করেছে। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলেন ঃ আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন হলো দুর্গা। সমস্ত দেশ তাঁকে মা বলে' ডাকবে।

১৯১৬ সালে লর্ড রোনাল্ড্‌সে বাংলার গভর্ণর হয়ে এসে লেখেন ঃ "যখন ইংরাজরা বাংলাদেশে আসে তখন এই দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা। মানুষের মধ্যে কোন তেজ ছিল না, ধর্মের কোন শক্তি ছিল না ; ধর্ম শুধু কতকগুলি নিরর্থক মন্ত্র-তন্ত্রে পরিণত হয়েছিল, ফলে জাতির মেরুদন্ড ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই সমস্ত দুর্বল জাতির যা হয়ে থাকে ভারতবর্ষেরও তাই হয়েছিল। এবং এখানে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় জাতির এই দৌর্বল্যের এবং তদ্‌জনিত নিষ্ক্রিয়তার কারণে। এবং সে-কারণ ভারতবাসীরা ইংরাজ শাসন মেনে নেয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে ইংরাজদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কিন্তু পরে তারা এর থেকে মুক্ত হতে প্রয়াসী হয় এবং জাতির মধ্যে নতুন প্রবক্তাদের আবির্ভাব হয় যারা জাতিকে আবার তার প্রাচীন আদর্শে উজ্জীবিত করে। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা'র স্থানে প্রতিষ্ঠা করে' জাতীয়তাবাদকে এক নতুন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে।"[৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলতা এবং নৈরাজ্যের প্রধান কারণ ছিল মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক চেতনার সম্পূর্ণ অভাব। ক্ষণস্থায়ী সরকার, বিদ্রোহ, রাজন্যবর্গের কুচক্র, চক্রান্ত (conspiracies) এবং খুনোখুনি এত বেড়ে গিয়েছিল যে, মানুষ সরকারের প্রতি সমস্ত আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল এবং সরকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে আমাদের দেশে বারবার বিদেশ থেকে মুষ্টিমেয় লোক এসে যে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার প্রধান কারণ, দেশের সরকার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সম্পূর্ণ উদাসীনতা। সাধারণ মানুষের কাছে দেশের রাজ-সরকার শুধুমাত্র কর ও খাজনা আদায়কারী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। রাজন্যবর্গের সাম্রাজ্য-বিস্তার এবং বিলাসিতা সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। তাই প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—'রাজায় রাজায়

(৬) Lord Ronaldsay—The Heart of Aryavarta ; P. 99.

যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়'। লর্ড ক্লাইভ স্বীকার করেছেন যে, যে হাজার হাজার লোক পলাশীর যুদ্ধ দেখতে এসেছিল, তারা সকলে যদি একটি করে ঢিলও ছুঁড়তো তাহলে যুদ্ধে কি হতো বলা যায় না, কিন্তু কেউই ঢিল ছোঁড়েনি, সবাই এসেছিল মজা দেখতে। এইভাবেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়।

দেশের মানুষের দেশাত্মবোধ এবং জাতীয়তাবাদী প্রেরণার জাগরণ প্রকৃত-পক্ষে ইংরাজ শাসনের পরে, এবং ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার ফলেই সৃষ্টি হয়; এবং ইংরাজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ আন্দোলন শুরু হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারের হাতে ১৮৬১ সালে শাসনভার তুলে দেওয়ার পর। তারপর থেকেই ব্রিটিশরাজের শোষণ ও নিপীড়ন বিশেষ বৃদ্ধি পায় যেটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ততটা প্রকট হয়নি। কিন্তু আগে যা সম্ভব হয় নি এখন তা হলো। একদল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে নূতন পদ্ধতিতে আন্দোলন শুরু করলো। তবে, দ্বিমত দেখা গেল মত ও পথ নিয়ে।

বস্তুত ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ প্রথা আইনানুগ চালু করার পর, ব্রিটিশ সরকার আর বিশেষ কোন সমাজ-সংস্কারক কাজ করেনি, বহুদিন পর ১৯৩০ সালে সারদা আইন পাশ করার আগে। এই ব্রিটিশ শাসনকালকেও খানিকটা মোগল রাজত্বের শেষ পর্যায়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ১৮৫৭ সালের পর ইংরাজ সরকার শুধুমাত্র নিজেদের শাসন বজায় রাখতেই চেয়েছিল, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সম্পদ লুঠ করার জন্যে। লর্ড লিটন (Lord Lytton)-এর প্রতিক্রিয়াশীল শাসন-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষকে তাঁদের নিস্পৃহতা (indifference) থেকে জাগিয়ে তোলে এবং নতুনভাবে জন-জাগরণ শুরু হয়। ১৮৭৮ সালের প্রেস অ্যাক্ট, অস্ত্র-শস্ত্র রাখা এবং ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন, দুর্ভিক্ষের তহবিলের টাকা আফগান যুদ্ধে ব্যবহার; ১৮৮২ সালে ইলবার্ট বিল, ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় বিল—এই সব নতুন আইন ও ব্যবস্থা মানুষকে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে।

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস একজন ইংরেজের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের সঙ্গে দেশের জনমতের একটা যোগাযোগ স্থাপন করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৮৯৬ সালেই জাতীয় কংগ্রেস প্রায় দু-ভাগ হয়ে যায়। একদল যাঁরা নরমপন্থী (Moderates) তাঁরা সবকিছুই আইনানুগভাবে করতে চান এবং সরকারের সঙ্গে দেশের জনপ্রতিনিধিদের

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাড়াতে চান সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে। আর, আরেক দল হলেন চরমপন্থী (Extremists)। এই চরমপন্থীদের বিশেষ প্রতিপত্তি হলো বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে, এবং চরমপন্থীদের নেতৃত্বকে নাম দেওয়া হয় লাল-বাল-পাল গ্রুপ (লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল)। তাঁরা বললেন : "জাতীয় সরকারের পরিবর্তে সুষ্ঠু সরকার কাম্য নয়"। তাঁরা দেশবাসীর কাছে আবেদন করলেন বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে নামতে।

নরমপন্থীদের পন্থা— দেশের সমস্যার সমাধান সরকারের কাছে আবেদন ও দরখাস্ত মারফৎ করা। এই পন্থার বিরুদ্ধাচরণ করে' অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ ; পরবর্তীকালে শ্রীঅরবিন্দ) ১৮৯৩-৯৪ সালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লেখেন। অরবিন্দ তখন বরোদার রাজ কলেজে অধ্যাপনা করতেন এবং মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হন।

এরপর স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দেশাত্মবোধের প্রয়োজনীয় ধর্ম ও দর্শনের বাণী প্রচার করেন। পাশ্চাত্য দেশে ভারতের দর্শন ও ধর্ম প্রচার করে' বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে দেশে ফিরে দক্ষিণ ভারতের কুম্বকোনামে বলেন : "আমাদের দেশের এখন প্রয়োজন লোহার মত শক্তি, ইস্পাতের মত মানসিক দৃঢ়তা এবং অদম্য সাহসিকতা যা কোন বাধা মানবে না।"[৭] তিনি দেশবাসীকে গীতা এবং বেদান্তদর্শন অনুধাবন করে' শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করতে উপদেশ দেন। গীতার বাণী ব্যাখ্যা করে' বিবেকানন্দ বলেন : "দুর্বলের (পৃথিবীতে) কোন স্থান নেই। দুর্বলতা থেকেই দাসত্ব। দুর্বলতাই মৃত্যু।" বিবেকানন্দই প্রথম বাঙ্গালীর মনে মহাজাতির আদর্শ ফুটিয়ে তোলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে মায়ের ছবি প্রস্ফুটিত করেন, বিবেকানন্দ সেই মা-কে জীবন্ত করে' তোলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলাদেশে শুরু হয় তা' বিবেকানন্দের এই দৌর্বল্য পরিহার করার প্রচারের প্রত্যক্ষ ফল ; এবং সেই বৈপ্লবিক আন্দোলন বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত আনন্দমঠে সন্ন্যাসীদের গুপ্ত-সংঘের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈপ্লবিক চেতনা ও দেশাত্মবোধের যে বীজ বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ

(৭) বিমানবিহারী মজুমদার রচিত 'Militant Nationalism in India' পুস্তকের ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য

রোপণ করেন তার বিকাশ ঘটে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এবং ক্রমশঃ মানুষ সেই মন্ত্রে আকৃষ্ট হয়। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ইনি নিরালম্ব স্বামী বলে' পরিচিত হন) উনিই প্রথম দেশের শক্তি দিয়ে দেশমাতাকে বন্ধনমুক্ত করার জন্য সংগঠনের কথা চিন্তা করেন এবং বিবেকানন্দের আদর্শকে বাস্তব রূপ দেন। তিনিই প্রথম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীদের অস্ত্রশিক্ষা দেবার কথা ভাবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালে বরোদায় গিয়ে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন।[৮] অরবিন্দ তখন ICS পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে দেশে ফিরে বরোদার মহারাজার গায়েকওয়াড় কলেজের উপাধ্যক্ষ। অরবিন্দ বরোদার রাজার বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন এবং অরবিন্দের সুপারিশে যতীন্দ্রনাথ মহারাজার সৈন্যে অস্ত্রশিক্ষার জন্য ভর্তি হন। সেই সময় বাঙ্গালীদের সৈন্যে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, তাই যতীন্দ্রনাথ 'যতীন্দর উপাধ্যায়' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করে' সৈন্যদলে ভর্তি হন।

১৯০২ সালে যতীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করে' শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রে অস্ত্রচালনা এবং বৈপ্লবিক রাজনীতি— দুই বিষয়েই শিক্ষা দেওয়া শুরু হয়। যতীন্দ্রনাথ এই বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতে থাকেন যাতে পুলিস এটা গোপন বৈপ্লবিক ঘাঁটি বলে' সন্দেহ না করে। যতীন্দ্রনাথের এই কার্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের প্রধানা শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা এবং এই কেন্দ্রের লাইব্রেরীতে নিবেদিতা দু'শোর বেশী বই দান করেন। এই আড্‌ডাটির যতীন্দ্রনাথ নাম দেন 'ইস্ট ক্লাব' এবং ক্লাবের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্যা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতা ভারতবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে' দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে।

বারীন ঘোষ তাঁর 'অগ্নিযুগ'-এর প্রথম খণ্ডে লিখেছেন : "এক হিসাবে তাঁর (অরবিন্দের) বাংলায় বিপ্লবচেষ্টার প্রথম সঙ্গী বা হাতের যন্ত্র ছিলেন শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমাদের মিলিটারী যতীনদা। আমার বাংলায় আসার ৬ মাস আগে বরোদা থেকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে প্রথম আসেন যতীনদা' সরলা দেবীর[৯] নামে অরবিন্দের স্বহস্তলিখিত পরিচয়পত্র নিয়ে। যতীনদার

(৮) বারীন্দ্র কুমার ঘোষ—অগ্নিযুগ : পৃঃ ৩৩

(৯) রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী।

শ্বশুরবাড়ী ছিল বর্ধমান জেলার খানা জংশন স্টেশনের কাছে চান্না গ্রামে।...এই তেজস্বী যুবক যতীন্দ্রনাথকে পেয়ে অরবিন্দ ও তাঁর বন্ধু লেফটেন্যান্ট মাধব রাও হাতে আকাশের চাঁদ পেলেন ; দেশের ভাবী মুক্তি আয়োজনের জন্য তাঁরা এমনই তেজপুঞ্জদীপ্ত উচ্চাভিলাষী মানুষ খুঁজছিলেন, ভাগ্যচক্র করে' দিল এই মণিকাঞ্চন যোগ।... আমিই হলাম সার্কুলার রোডের এই রাজনীতির স্কুলের প্রথম ছাত্র, তারপর ক্রমশঃ জুটলো এসে দেবব্রত বসু, নলিন মৈত্র, জ্যোতিষ সমাজপতি, ভূপেন দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী, এই ধরনের অনেক ভাবোন্মাদ মানুষ। আমি এসে সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়কে এই বিপ্লব কেন্দ্রটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। এই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পরমভক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পূর্বে দেওঘর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, আমাদের ছাত্রজীবনের মন্ত্রগুরু।" (পৃঃ ৩৩, ৩৬, ৬৮)।

এই ১৯০২ সালেই সতীশচন্দ্র বসু "অনুশীলন সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্ট ক্লাবের মত অনুশীলন সমিতিও জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের জন্য বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে দৈহিক শক্তি ও মানসিক বল বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দিতে থাকে। বাংলাদেশে তখন অস্ত্র রাখার ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি। তাই লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতির মাধ্যমে অনুশীলন সমিতি শিক্ষা দিত। এগুলি প্রচলিত দেশীয় শক্তিসাধনার মাধ্যম বলে' সরকারের কোপদৃষ্টি এড়ানো সহজ ছিল। ক্রমশ কলকাতা ও আশেপাশে এই ধরনের শক্তিসংঘ ও ক্লাব চারিদিকে গজিয়ে ওঠে এবং বহু ভদ্রসন্তান এই সব ক্লাবে ভর্তি হন। অনুশীলন নামটি সতীশ বসু বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' থেকে গ্রহণ করেন।

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনা করে' লেখেন ঃ অনুশীলন হলো মানুষের সমস্ত ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করে' তার সংযুক্তি করা— যাতে এই উন্নত ও সমৃদ্ধ শক্তি ও মননশীলতাকে দশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ এই অনুশীলন সমিতি সংগঠন করার জন্য উৎসাহ দেন, এবং অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁরা বেলুড় মঠে স্বামীজীর কাছে প্রায়ই যেতেন এবং স্বামীজীর দ্বারাই তাঁরা জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লব সম্বন্ধে অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন। এই বেলুড় মঠেরই একজন সন্ন্যাসী স্বামী সারদানন্দ অনুশীলন সমিতিতে গীতা পড়াতেন। বাংলাদেশের বিপ্লবের আদর্শের প্রচারের কাজে অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী ও মঠ তখন সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতিতে বেলুড় মঠের স্বামী সারদানন্দের গীতা সম্পর্কে শিক্ষাদান তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তৎকালীন বৈপ্লবিক নেতাদের অনেকেরই এইসব মঠ এবং সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল যেজন্য বাংলাদেশের অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক আন্দোলনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে থেকে যায়।

আপার সার্কুলার রোডে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাঁটি স্থাপনের কিছু-দিন পরেই অরবিন্দ এবং তাঁর ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কলকাতায় আসেন। উদ্দেশ্য ছিল এই ঘাঁটিটিকে শক্তিশালী করা এবং বাংলাদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন সংগঠিত করা। অরবিন্দ কিছুদিন থাকার পর বাঙ্গালীদের দলাদলিতে বিরক্ত হয়ে বরোদায় ফিরে যান; বারীন রয়ে যান। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই, ১৯০৩ সালে, অরবিন্দকে পুনরায় কলকাতায় আসতে হয়, বারীন এবং যতীন্দ্র-নাথের মধ্যে মতবিরোধ ও ঝগড়া মেটাতে। সেই সময় অরবিন্দ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে থাকেন। এই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই ইতালীয় বিপ্লবী গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) এবং ম্যাটসিনির (Mazzini) জীবনী বাংলায় লেখেন যা পরে বাঙ্গালী বিপ্লবীদের কাছে গীতার মতই সমাদৃত হয়। অরবিন্দ যখন যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়ীতে ছিলেন তখন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) তাঁর সঙ্গে দেখা করে' তাঁর কাছে রাজনৈতিক শিক্ষা নেন।

এই সময় অনুশীলন সমিতির সভাপতি প্রমথ মিত্র অরবিন্দের বরোদা গোষ্ঠীর (বারীন, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি) এবং অনুশীলন সমিতির নেতাদের এক মিলিত বৈঠকে দুই দলকে এক করেন। এই সংযুক্ত অনুশীলন সমিতির সভাপতি হন প্রমথ মিত্র; সহ-সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু) এবং কোষাধ্যক্ষ হন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র)। প্রমথ মিত্রই (ইনি পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন) প্রথম স্বাধীনতার বৈপ্লবিক প্রয়োজনে একটি শক্তিশালী সংগঠনের গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং সেই সংগঠনের জন্য প্রচেষ্টা করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি সুসংগঠিত বৈপ্লবিক দল গড়ে' তোলা—যার একটি গোপন শাখা থাকবে যার মধ্যে স্বাধী-নতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামী কর্মীরা থাকবে এবং একটি সাধারণ খোলাখুলি শাখা থাকবে যেখানে যে কেউ শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য লাঠিখেলা, কুস্তি করতে পারবেন এবং লাইব্রেরীতে পড়তে পারবেন; এবং এঁদের মধ্য থেকেই বাছাই করে' বিপ্লবের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী কর্মীদের দলে টানা হবে। সাধারণের জন্য উন্মুক্ত শাখাটি দলের কর্মী বাছাইয়ের জন্য কাজে লাগানো হবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি দুটি দলের সংযুক্তিকরণ করেন যাতে প্রত্যেকটি দলের বাছাই করা লোককে নিয়ে একটি সুসংবদ্ধ বৈপ্লবিক সংগঠন করা যায়। সংযুক্তি-

করণের পর থেকে অনুশীলন সমিতিই বাংলাদেশের প্রথম বৈপ্লবিক সংগঠন হিসাবে সমস্ত বিপ্লবীদের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করে।

১৯০৫ সালে ইংরাজ সরকার বঙ্গ-বিভাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই অরবিন্দ আবার বরোদা থেকে কলকাতায় আসেন। তারপরেই তিনি বরোদার চাকরী ছেড়ে দেন বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার জন্য। এই সময়েই তিনি 'ভবানী মন্দির' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন যার মধ্যে বিপ্লবীদের আদর্শ এবং উদ্দেশ্য নির্দেশ করা হয়। 'ভবানী মন্দির' মানুষকে শক্তির সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে. যাতে করে' স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট সংগ্রামী হওয়া যায়।

বঙ্গ-বিভাগ করার সিদ্ধান্ত যখন ইংরাজ সরকার নেয় সেই সময় বাংলাদেশের বহুস্থানে বিভিন্ন সমিতি ও আশ্রম সংগঠিত হয়ে গেছে—শরীরচর্চা এবং বিপ্লব-সাধনার উদ্দেশ্যে। এক এক জায়গায় এই সব সমিতি এক এক নামে গড়ে ওঠে। যেমন, আত্মোন্নতি সমিতি বহুবাজারে, বরিশালে বান্ধব সমিতি, ময়মনসিংহে সুহৃদ ও সাধনা সমিতি, খুলনা এবং ফরিদপুরে ব্রতী সমিতি। এদের সকলেরই উদ্দেশ্য একই ছিল—বিপ্লবের কেন্দ্র সংগঠন করা এবং পরে এই সমস্ত সমিতিগুলিকেই সরকার বে-আইনী ঘোষণা করেন। এই সমস্ত সমিতিকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করতে হতো এবং এদের নেতারা অত্যন্ত শৃংখলাবদ্ধ ছিলেন, দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এঁদের সকলেরই আনুগত্য ছিল অনুশীলন সমিতির সঙ্গে।

১৯০৫ সালের শেষদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রমথ মিত্র এবং বারীন ঘোষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় বিপ্লবের পন্থা নিয়ে। প্রমথ মিত্র মনে করেন যে, আগে দেশের সর্বত্র সুশৃংখল সংগঠন করে' তারপরে বৈপ্লবিক কার্যক্রম শুরু করা উচিত। অপর পক্ষে বারীন ঘোষ মনে করেন যে, বৈপ্লবিক কার্যক্রম শুরু করলে বাঙ্গালীদের মধ্যে নবজাগরণ শুরু হবে এবং বাঙ্গালীরা বিপ্লবের সামিল হয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আরও প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে নামবে। ১৯০৬ সালে এই বিরোধ মেটাবার জন্য রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে সারা বাংলার বিপ্লবী সংস্থাগুলির একটি সভা ডাকা হয়। তাতে সাময়িকভাবে একটা মিটমাট হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বারীন তাঁর নিজের একটি দল গঠন করেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। বারীন মনে করেন বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার সময় আসন্ন। এবং সেই উদ্দেশ্যেই বারীন ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। এই

পত্রিকার পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সহযোগী ছিলেন দেবব্রত বসু, আরবেলিয়ার অবিনাশ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়ের জ্ঞানি ভ্রাতা) এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)। এই সময়েই সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের আর্থিক সাহায্যে কলিকাতার সন্নিকটে যাদবপুরে ন্যাশনাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং অরবিন্দ বরোদার কাজ ছেড়ে ন্যাশনাল কলেজে চাকরী নেন। ১৯০৬ সালের নভেম্বর মাসে সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিন পালের সহযোগিতায় অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার প্রকাশও শুরু করেন।

এই 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হলেন তাঁরাই সাধারণভাবে পরে যুগান্তর দল বলে' পরিচিত হয়ে গেলেন এবং এঁরা বিপ্লবীদের মধ্যে চরম-পন্থী বলেও আখ্যা পেলেন এবং এই দলটি যুবক সম্প্রদায়ের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠলো।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং অরবিন্দের নেতৃত্বে যে বৈপ্লবিক মনোভাব বাংলাদেশে সৃষ্টি হলো তার প্রতিক্রিয়া বিশেষ-ভাবে পরিলক্ষিত হলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯০৬ সালের কলিকাতা অধিবেশনে। এই অধিবেশনেই ভগিনী নিবেদিতা জাতীয় কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান, এবং এই অধি-বেশনেই প্রথম 'বন্দে মাতরম্' গানটি জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিবেশিত হয়। এই অধিবেশনেই লালা লাজপত রায় জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক পন্থা পরিবর্তন করে' আরও বেশী সংগ্রামী করার জন্য আহ্বান জানান। এরই প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় ১৯০৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে। সুরাট অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস থেকে লাল-বাল-পাল চরমপন্থীদের বহিষ্কার করা হয়।

লাল-বাল-পাল নামে কংগ্রেসের ভিতর যে উপদলটি চরমপন্থী হিসাবে পরিচিত হয় সেই উপদলটির সূচনা হয় ১৯০৬ সালের জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই অধিবেশনেই অরবিন্দ বাংলার কংগ্রেসীদের তিলককে তাদের নেতা বলে' মেনে নিতে বলেন। এই উপদলীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আবার লাজপত রায় ছিলেন সর্ব দক্ষিণে, বিপিন পাল ছিলেন মধ্যপন্থী এবং অরবিন্দ ছিলেন চরম বামপন্থী।[১০] অরবিন্দের

(১০) Amalesh Tripathi—The Extremist Challenge, P. 124

স্বদেশী ডাকাতি এবং সন্ত্রাসমূলক কাজের সমর্থন করার প্রতিবাদে বিপিন পাল মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। বিপিন পালের সঙ্গে মতপার্থক্যের ফলে অরবিন্দ বিপিন পালের কাছ থেকে 'বন্দে মাতরম্'-এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়ে নেন এবং তখন থেকে তাঁর ভাই বারীন ঘোষের 'যুগান্তর' মারফৎ প্রচারিত পথকে সমর্থন করেন। অরবিন্দ এবং বারীনের সহযোগী, এবং আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী, হেমচন্দ্র কানুনগোর মতে অরবিন্দ প্রথম থেকেই বারীনের যুগান্তর দলের সমর্থক ছিলেন এবং ব্যামফিল্ড ফুলারের জীবননাশের চেষ্টা, স্বদেশী ডাকাতি এবং সন্ত্রাসমূলক পথকে অরবিন্দ শুরু থেকেই সমর্থন করে এসেছেন।[১১]

সুরাটে যখন জাতীয় কংগ্রেস বিভক্ত হয়, অরবিন্দ মনে করেন তা ভগবানের ইচ্ছার ফলেই হয়েছে এবং ভালই হয়েছে। সেই সময় অরবিন্দ একটি কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক দল গঠন করার কথা চিন্তা করছেন, যে-দল দেশে সম-সরকার (parallel Government) হিসাবে কাজ করবে। বহুদিন পরে প্রকাশিত "Aurobindo on Himself and on the Mother" পুস্তকে অরবিন্দ স্বীকার করেন যে, তিনি বৈপ্লবিক কাজকর্ম পরিচালনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছিলেন এই কারণে যে, যদি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) ফলপ্রসূ না হয় তাহলে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন।

অরবিন্দ, বারীন এবং অন্যান্যদের জেল হওয়ার পর এবং বিশেষ করে' অরবিন্দ রাজনীতি থেকে বিদায় নেবার পর এই চরমপন্থী বৈপ্লবিক সংগঠনের নেতৃত্ব যতীন মুখোপাধ্যায়ের উপরই ন্যস্ত হয়; এবং যতীন মুখোপাধ্যায়ের 'ডান হাত' হিসাবে নরেন ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে এম, এন, রায়) ১৯১৪ সালে যুগান্তর দলকে পুনরুজ্জীবিত করে' ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ করেন।

---

(১১) হেমচন্দ্র কানুনগো— বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ; পৃঃ ১১৮–১৪৮

এক ঃ প্রারম্ভ

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। তার কয়েকদিন আগে—সেদিন বাইরে খুব ঘনঘটা, প্রবল বৃষ্টি, তার মধ্যে এক নিভৃত সন্ধ্যায় একজন ছয় ফুট লম্বা, ধুতি-পরা বাঙ্গালী যুবক কলকাতার জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করেন। অনেকদিনের বাসনা পূর্ণ হবে এই আশায় তিনি কলকাতার জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র-সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল—ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘটানো। কয়েকবার এই সাক্ষাৎকার ও আলোচনা চলে।

এই যুবক হলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় বলে' পরিচিত)। আলোচনার পর উনি বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় আসতে বলেন; এবং তারপরেই কলকাতার বিপ্লবী সংস্থার এক গোপন সভায় যতীন মুখোপাধ্যায়কে বৈপ্লবিক বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়।[১] তারপর তিনিও জার্মানদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেন। এই আলোচনার মাধ্যমেই ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা তৈরী হয়।

১৯১৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলকাতার জার্মান রাষ্ট্রদূত বার্লিনে তাদের সরকারকে জানানঃ ভারতে "বিশেষ করে' বাংলাদেশে গোপন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির কাজকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ", এবং সুপারিশ করেন যে, তাঁর "সরকারের ভারতবর্ষে ইংরাজ-শক্তির অবসান ঘটানোর জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত; এবং সেকারণ এই বিপ্লবীদের সাহায্য করা প্রয়োজন।"[২]

জার্মানরা এরপর ব্যাটাভিয়াতে একজন প্রতিনিধি পাঠাবার জন্য বাংলাদেশের বিপ্লবী সংস্থাকে জানান, যাতে করে' সেখানে এই অস্ত্রসাহায্যের চুক্তিটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া যায়। এই পরিকল্পনার প্রধান প্রবক্তা হিসাবে নরেন ভট্টাচার্যকে এরপর ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে ব্যাটাভিয়া পাঠানো হয়— বাঙলার বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির প্রতিনিধি হিসাবে ঐ পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য।

একদিকে যখন বাংলার বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরাজ শাসনের অবসান ঘটাবার পরিকল্পনা করছিল, ভারতের অন্যদিকে তখন অন্য এক নাটক শুরু হয়। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসে। সেবার এক বিশেষ অতিথি ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত হন এবং তাঁকে সবাই বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানায়। এই বিশেষ অতিথি ছিলেন মাদ্রাজের তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণর লর্ড পেণ্টল্যান্ড। ঐ অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করে' ইংরাজ সরকারের প্রতি ভারতের আনুগত্য জ্ঞাপন করেন।

মহাত্মা গান্ধীও তখন সবে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরেছেন, এবং কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের কিছুদিন বাদেই মহাত্মা গান্ধী ভারতীয়দের ব্রিটিশ সৈন্যে ভর্তি করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তেই নরেন ভট্টাচার্য ভারতকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন।[৩]

চাংড়িপোতায় বাস

এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ পরিবারে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। ওঁর পিতা, দীনবন্ধু ভট্টাচার্য মেদিনীপুর জেলার ক্ষেপুত গ্রামে ক্ষেপুতেশ্বরীর মন্দিরের পুরোহিত বংশের শেষ প্রধান পুরোহিত ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার কাছে দেবী (ক্ষেপুতেশ্বরী) যে নির্দেশনামা দেন বলে কথিত আছে, সেই নির্দেশ অনুযায়ী এই বংশের জেষ্ঠ্য সন্তানই একমাত্র দেবীর সম্মুখে পুরোহিত হিসাবে বসবার অধিকারী। দীনবন্ধু দেশ ছেড়ে চলে আসার পরই এই বংশের পতন শুরু হয়। নয়জন ভাই এবং এক বোনকে রেখে দীনবন্ধু গ্রাম ছেড়ে চলে আসেন, তবে তিনি প্রতি বৎসর অন্তত একবার গ্রামে ফিরতেন তাঁর পুরোহিতের আসনে বসে পুজার কাজ শুরু করে দেবার জন্যে এবং সেই সময় তিনি একজনকে বৎসরের বাকিভাগ কাজ চালিয়ে যাবার জন্য দায়িত্ব দিয়ে আসতেন। এই দেবীর কাহিনী এবং প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে তিনি যে বিশিষ্ঠ স্থানের অধিকারিণী ছিলেন সেই সম্পর্কে নরেন তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় পরে লেখেন :

"দেব-দেবীর ইতিহাসে একসময় এক রাজার দুহিতা হিসাবে শক্তির (Cosmic Energy) আবির্ভাব হয়। এই শক্তি শিবের আরাধনা করেন। শিব ছিলেন দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাযোগী—পৃথিবীর পুরুষ-শক্তি; তিনি সবসময় বাঘের চামড়া পরে থাকতেন, ষাঁড়ের পীঠে করে সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে মৃতের জগতে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর চারপাশে ভূত-প্রেতের দল। কিন্তু যদিও শিব স্বর্গ মর্ত পাতালের কোনকিছুর প্রতি আসক্ত ছিলেন না, তা'স্বত্বেও মহাদেব,—জগতের স্ত্রী-শক্তি, সতীর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন না। সতীর তপস্যায় সাড়া দিয়ে তিনি সতীর বাবার দরবারে হাজির হন। কিন্তু শিবের ছন্নছাড়া মূর্তি, পোষাক এবং তাঁর ভক্তবৃন্দকে দেখে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি পণ করেন যে তাঁর কন্যার যদি এই ভবঘুরেকে—যার গলায় সাপের মালা—তাঁকে বিবাহ করবার মত প্রবৃত্তি হয়, তা'হলে

তিনি আর তাঁর কন্যার মুখদর্শন করবেন না। কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ শক্তির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ একজন সামান্য রাজার উষ্মাকে অগ্রাহ্য করলো। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ও সুখ ত্যাগ করে সতী শিবের ভুতুড়ে আড্ডায় চলে গেলেন।

"রাগে রাজা পণ করলেন এই অপমানের তিনি প্রতিশোধ নেবেন; তিনি পৃথিবীর সমস্ত ব্রাহ্মণদের এক বিরাট যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানালেন। স্বর্গ থেকে দেবতারাও এলেন নিমন্ত্রিত হয়ে; একমাত্র মহাদেব নিমন্ত্রিত হলেন না। কারণ ভূত-প্রেতদের ঐ নেশাখোর নেতা রাজার কন্যাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। তাই তাকে অপমান করা প্রয়োজন। শিব মানুষ এবং দেবতাদের এই সংকীর্ণতার উর্ধে ছিলেন কিন্তু অপমানে সতীর হৃদয় ব্যথিত হয়। তিনি বাবার কাছে গিয়ে তাঁর মন বদলাবার মনস্থ করলেন···

"সতীকে তাঁর বাবা আদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন না; উল্টে একজন ভবঘুরে, যে শ্মশানে বসবাস করে, তার সঙ্গে চলে যাওয়ার জন্যে অপমান করলেন। এবং শিবের এই অবমাননা সহ্য করতে না পেরে তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এই রকম মুহূর্তে শিব সেখানে উপস্থিত হয়—তাঁর প্রিয়তমার মৃত্যুর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে······শোকে জর্জরিত শিব তাঁর প্রিয়তমার দেহ তুলে ত্রিশূলের উপর রাখেন এবং সেই অবস্থায় নটরাজ মূর্তিতে তিনি সেই নটরাজ নৃত্য শুরু করেন—যাতে পৃথিবী এবং স্বর্গ কম্পিত হতে থাকে।

"এই নটরাজ নৃত্যে যে ভয়ানক কম্পন সৃষ্টি হয় তার ফলে সতীর দেহ খন্ড-বিখন্ড হয়ে চতুর্ধারে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। বাহান্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যে বাহান্ন স্থানে সতীর দেহখন্ড পড়ে সেই বাহান্নটি স্থান তীর্থক্ষেত্র হিসাবে গণ্য হয়। এবং ধার্মিক হিন্দুদের সেই বাহান্ন তীর্থে যাওয়া একটি বিরাট ধর্মীয় কাজ। সতীর একটি কোড়ে আঙ্গুল ক্ষেপুতে পড়ে যেখানে ক্ষেপুতেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। এই পবিত্র অঙ্গুলিটি একটি বাক্সের মধ্যে রাখা হয় এবং প্রধান পুরোহিতের আসনের নীচে সেটি পুঁতে রাখা হয়।"[২]

---

(২) "Disintegration of a Priestly Family"—এম, এন, রায়ের লেখা 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত।

বংশের এই পুরোহিতের কাজ ছেড়ে এবং তার সঙ্গে মেদিনীপুরের গ্রামে মন্দিরের যে বিরাট সম্পত্তি তাও ত্যাগ করে দীনবন্ধু ২৪ পরগনা জেলার আরবেলিয়া গ্রামে এক বিদ্যালয়ে প্রধান পণ্ডিতের কাজ নিয়ে শিক্ষকতা করতে চলে আসেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাংড়িপোতা গ্রামের এক সৎ ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৭২ সালে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর দ্বিতীয় সন্তান—নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আরবেলিয়া গ্রামে ২১শে মার্চ ১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করে।[৩]

১৮৯৯ সালে দীনবন্ধু তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গ্রাম চাংড়িপোতায় চলে যান। দীনবন্ধু তাঁর শেষ জীবন গঙ্গার ধারে কাটাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। আদি গঙ্গা—গঙ্গার আদি পথ চাংড়িপোতা কোদালিয়ার পাশ দিয়ে—এই পথেই আগে সাগরে গিয়ে পড়েছিল। এবং সে কারণ দীনবন্ধু তাঁর শ্বশুরকে কিছু কিছু টাকাও দিয়ে যেতেন ; তাঁর শ্বশুরের কোন পুত্র-সন্তান না থাকায়, তিনি ঐ সম্পত্তি দীনবন্ধুকে হস্তান্তর করে যান।[৪]

চাংড়ীপোতায় নরেনের অনেক নতুন বন্ধু হয় এবং অনেক নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। চাংড়িপোতাতেই হরিকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। হরিকুমার ছিলেন তাঁর মাতুলালয় সম্পর্কে ভাই। এবং এই হরিকুমারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয় এবং দু'জনে সারাজীবন রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। হরিকুমার ছাড়াও আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয় এই চাংড়িপোতায় যাঁদের অনেকেই দেশের মুক্তির জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়[৫], শৈলেশ্বর বসু[৬], শৈলেশ্বরের ভাই শ্যামসুন্দর, ফণী চক্রবর্তী[৭] এবং আরও অনেকে।

(৩) এম, এন, রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিত কুমার ভট্টাচার্য্যের কাছে রক্ষিত তার পিতার ডায়েরী থেকে এই তারিখটি পাওয়া যায়। ডায়েরীতে বাংলা তারিখ ছিল ৮ই চৈত্র, ১২৯৩ সাল।

(৪) ললিত কুমার ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা।

(৫) চাংড়িপোতার বিপ্লবীদলের একজন বিশিষ্ট নেতা, ইনি ১৯৩৭ সালে দেউলী জেলে মারা যান।

(৬) ১৯১৫ সালে বালেশ্বরে 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে একটি দোকান খুলে উনি যতীন মুখোপাধ্যায়ের গোপন ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

(৭) ইনি নরেন ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়া যাবার সময় সঙ্গী হন এবং সেখানে ধরা পড়েন। সিঙ্গাপুর জেলে ওঁর ওপর নির্মম অত্যাচার করে ওঁর কাছে একটি

চাংড়ীপোতা এবং নিকটবর্তী হরিনাভি, কোদালিয়া এবং রাজপুর গ্রামগুলিতে তখন সমাজ এবং বিপ্লবের নতুন নতুন চিন্তাধারার ঢেউ এসে পৌঁছেছে। এই অঞ্চলেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বহু ধর্মীয় এবং সামাজিক সংস্কারকগণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন রাজনারায়ণ বসু (অরবিন্দ এবং বারীন ঘোষের মাতামহ), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, যিনি বিদ্যাসাগরের সহযোগী ও সোমপ্রকাশের সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিবনাথ শাস্ত্রী যিনি পৈতা ছিঁড়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন নরেনের মা'র মামা এবং তাঁর প্রভাব ঐ বংশের যুবকদের উপর খুব প্রগাঢ়ভাবে দেখা দেয়। আবার, রাজনারায়ণ বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রীই উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে প্রথম গোপন বিপ্লবী সংস্থা সংগঠনের চেষ্টা করেন—যার প্রভাবেই নবগোপাল মিত্র জাতীয় মেলার উদ্বোধন করেন।

আর একজন যিনি যুবক নরেনকে অনুপ্রাণিত করেন তিনি ছিলেন স্থানীয় স্কুলের ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী প্রধান শিক্ষক উমেশ দত্ত। উমেশ দত্ত মহাশয়ই দ্বারকানাথ বিদ্যভূষণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন পরে সেই পাঠাগারটির পুনরুদ্ধার করে, এই পাঠাগারের মাধ্যমে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করতে থাকেন।[৮]

সেই সময় বোসের সার্কাস ছিল খুব জনপ্রিয়। এবং এই বোসের সার্কাস খেলা দেখেই নরেন এবং তাঁর বন্ধুরা শরীর-চর্চার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়। বোসের সার্কাস সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন ঃ "মতি (বোস) যা দেখাচ্ছে তা থেকেই বোঝা যায় দৈহিক শক্তি-সাধনায় বাঙ্গালীরা কি করতে পারে।"[৯]

হরিকুমার চক্রবর্তী পরে লেখেন "ছোটবেলা থেকেই নরেন খুব দৌরাত্মপ্রিয় ছিল। দূরে দূরে জায়গায় পায়ে হেঁটে বেড়ানো এবং বন, জঙ্গল, বাগানে ঘুরে বেড়ানো ওর নেশা ছিল। দৌরাত্মপনা করতে এবং বীরত্বপূর্ণ গল্পের বই পড়তে নরেন খুব ভালবাসতো। কিন্তু সব সময়েই নরেন দূরের কিছু একটা যেন খুঁজে বেড়াতো—যা নাগালের বাইরে, যা কষ্টসাধ্য, যাকে পাওয়া বা

স্বীকারোক্তি নেওয়া হয় যেটি Sedition Committee Report, 1918 এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৮) নরেন ভট্টাচার্য্য এই লাইব্রেরী সম্পাদক হন এবং প্রয়াত অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য যিনি পরে বিশ্বভারতীর সম্পাদক হন, তিনি এই লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট হন।

(৯) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ; পৃঃ ১১৭

জানার জন্য গভীর সাধনার প্রয়োজন। বহুরাত্রি নরেন শ্মশানে কাটিয়েছে ভূত দেখার জন্য। এবং পরে শ্মশানঘাটই বিপ্লবীদের গুপ্ত সভা ডাকার জন্যে নরেনের সবথেকে প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছিল"।[১০]

সাহসিকতা এবং অজানার পেছনে ছোটা এই দুটো জিনিষই নরেনকে অশান্ত করেছিল। প্রায়ই নরেন চাংড়িপোতা থেকে পায়ে হেঁটে ৩০ মাইল দূরে বেলুড় মঠে যেত, এবং ক্রমশ আরও অনেক মঠ ও আশ্রমে যেতে শুরু করে। তাছাড়া শৈশব থেকেই বাবার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, নরেন প্রাচীন ভারতীয় ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিল।

১৯০১ সাল নাগাদ নরেন শিবনারায়ণ স্বামীর সঙ্গে পরিচিত হয়। শিব-নারায়ণ স্বামীর দক্ষিণ কলিকাতায় একটি আশ্রম ছিল এবং কোদালিয়ায় তার একটি শাখা ছিল। কথিত আছে শিবনারায়ণ স্বামী সিপাই বিদ্রোহের একজন পলাতক আসামী ছিলেন। শিবনারায়ণ স্বামী মনে করতেন বহু শতাব্দী ধরে যে জাতি-ভেদ এবং অন্যান্য সংকীর্ণতা ভারতীয় সমাজে শিকড় গেড়ে বসেছে তাহাই ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ। তাই তিনি এমন সব মানুষ খুঁজতেন যারা হিন্দু সমাজের এইসব দোষত্রুটি সংশোধন করে সমাজকে তার প্রাচীন গরিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে এবং প্রকৃত মুক্তির পথ-প্রদর্শক হতে পারবে। নরেনের চারিত্রিক এবং আদর্শগত দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে শিবনারায়ণ স্বামী ওকে যোগ এবং বৈপ্লবিক রাজনীতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এই শিবনারায়ণ স্বামীর কাছেই নরেন লাঠি খেলাও শেখে। প্রকৃতি এবং দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানের পিপাসা নরেনের বেড়েই চলে এবং শিবনারায়ণ স্বামীর কাছে তার শিক্ষা চলতে থাকে। শিবনারায়ণ স্বামী সূর্যের উপাসক ছিলেন এবং সমস্ত রকম সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছিলেন। একদিন নরেন হরি-কুমারকে বলেঃ "সূর্যই সবরকম শক্তির উৎস; সেই মহাশক্তি সম্বন্ধে জানতে চাই।"[১১]

আরবেলিয়ায় থাকাকালীন নরেন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পর্কে পড়ে-ছিলেন। মহারাষ্ট্রের এই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় পুনাতে একটি "হিন্দু ধর্মের বাধা দূরীকরণ সমিতি" গঠন করেন। নরেন শিবনারায়ণ স্বামীকে প্রায়ই এই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে এবং তিলক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো।

(১০) হরিকুমার চক্রবর্তী—মানবেন্দ্রনাথ স্মরণে; র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত; পৃঃ ৩

(১১) হরিকুমার—ঐ; পৃঃ ৪

তিলক ১৮৯৭ সালে সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। নরেনের বৈপ্লবিক রাজনীতি সম্পর্কে এই আগ্রহ দেখে শিবনারায়ণ স্বামী ওকে জাতীয়তাবাদ এবং বিপ্লব সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে থাকেন। দেশকে বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে শিবনারায়ণ স্বামী নরেনকে দেশের মানুষকে ধর্মান্ধতার মোহ এবং বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করেন।[১২] গীতার উপদেশ উল্লেখ করে শিবনারায়ণ স্বামী নরেনকে বলেন যখন কোন মহৎ কিছুর জন্য প্রচেষ্টা করবে তখন সব সময়ই কৃতকার্যতার কথা ভাববে না এবং যে পদ্ধতি এই মহৎ কার্যের জন্য অবলম্বন করবে সেই পথ সম্পর্কেও বিচার করবে না।

কিন্তু শিবনারায়ণ স্বামীর কাছে শিক্ষানবিশি করেও নরেনের অশান্ত মন সন্তুষ্ট হয় না। এক সাধুর কাছ থেকে অন্য সাধু, এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে, নরেন যাতায়াত করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে যোগ ও ব্যায়াম চর্চাও চালিয়ে যেতে থাকে। এই জ্ঞানার্জনের অশান্ত প্রচেষ্টা ও সাধু অন্বেষণের সময় নরেন তৎকালীন বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু, রামদাস বাবাজীর সঙ্গে পরিচিত হয়। রামদাস বাবাজীর কাছ থেকে তখন নরেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং ভারতের অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে শিক্ষা নিতে থাকে। নরেনের অধ্যবসায় এবং অনিসন্ধিৎসু দেখে রামদাস বাবাজী মুগ্ধ হন এবং নরেনকে তাঁর শিষ্য করতে চান।[১৩]

নরেনের জ্ঞানপিপাসার কিন্তু নিবৃত্তি হয় না। এবং আরও জানবার ইচ্ছা তার মনকে আরও অশান্ত করে তোলে। কিছু করার জন্যে নরেন সেই সময় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা এবং প্রকৃত মুক্তির সাধনায় নরেন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে চায়। ১৯০৩-৪ সালে একদিন রাত্রে নরেন হরিকুমার এবং শৈলেশ্বরকে বলে "আমাদের একটা কিছু করতে হবে।[১৪] তিনজনে ঠিক করে তারপর দিন ভোরে তারা বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রকৃত পথ কি জানবার জন্য। জানতে হবে কোন পথ প্রকৃষ্ট, জানতে হবে মুক্তির সংজ্ঞা কি?

(১২) শিবনারায়ণ স্বামীর আর একজন ছাত্র বলেন: শিবনারায়ণ স্বামী মনে করতেন যে তাঁর সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে নরেনই প্রকৃত বিপ্লবী ছিল এবং আদর্শগতভাবে তাঁর সব থেকে প্রিয় ছিল।

(১৩) বিশ্ববিবেক—হরিকুমার চক্রবর্তী প্রবন্ধ; পৃঃ ২৫৫

(১৪) হরিকুমার—পৃঃ ৬

পরদিন সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে নরেন পায়ে হেঁটে আরবেলিয়ায় যায়। আরবেলিয়াতে নরেনের সম্পর্কীয় ভাই অবিনাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হয়। অবিনাশ তখন ১০৮ নং সার্কুলার রোডের ইষ্ট ক্লাবের সভ্য। অবিনাশ নরেনকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে অনুপ্রেরিত করে—বলে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন আদর্শবাদী যুবক।

অবিনাশ নরেনকে বারীন ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। ইষ্ট ক্লাব পরিদর্শন করে এবং বারীন ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নরেন চাংড়িপোতায় ফিরে আসে। ফিরে এসেই নরেন হরিকুমার, শৈলেশ্বর সবাইকে মিলিত করে বলে আমাদের এইরকম একটি সংগঠন চাংড়িপোতায় করতে হবে। চাংড়িপোতায় যে সংগঠন নরেন গোড়ে তোলে এই সংগঠনটি পরে যতীন মুখোপাধ্যায়ের একটি শক্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়ায়। এবং যুগান্তর দলের পুনর্গঠনের ব্যাপারে এই চাংড়িপোতার সংগঠনটির বিশেষ অবদান ছিল।[১৫]

এই সময় স্বাধীনতার যে আদর্শ নরেনের মনের মধ্যে ফুটে উঠেছিল তা শুধু বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়া নয়, মানুষের সামগ্রিক মুক্তির আদর্শই নরেনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। যদিও রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের আদর্শ এবং ধ্যান ধারণায় তখন থেকেই নরেন একাগ্রচিত্তে মনোনিবেশ করে, তবুও মনে হয় সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে তাঁর মন ক্রমশ ধাপে ধাপে এগোতে থাকে , এবং রাজনীতিই তার একমাত্র চিন্তা এ কর্ম হয়ে ওঠে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতা ও মুক্তির যে দার্শনিক ভিত্তি তাঁর গোড়া থেকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই আদর্শ শেষদিন পর্যন্ত তার মধ্যে ছিল। জীবনের শেষ দিকে, ১৯৪৬ সালের ৮ই হইতে ১৮ই মে দেরাদুনের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টীর রাজনৈতিক শিক্ষা শিবিরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নরেন, (তখন মানবেন্দ্রনাথ রায়) বলেন ঃ

> "যখন ১৪ বৎসর বয়সে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমি আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করি—যা হয়তো সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়ে যেতে পারে—তখন আমার আদর্শ ছিল মুক্তির আদর্শ। প্রাচীনপন্থী বিপ্লবীরা মুক্তিরই স্বপ্ন দেখতেন। সে যুগে আমরা মার্কস পড়িনি। সর্বহারাশ্রেণী সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলুম না। কিন্তু তা সত্বেও বহু বিপ্লবীই তাঁদের জীবনের বহু মূল্যবান সময় জেলে কাটিয়েছে, ফাঁসির মঞ্চে সহজেই জীবন

(১৫) বসুমতী (সাপ্তাহিক) ; পৃথ্বীন মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে।

দান করেছে। সর্বহারা শ্রেণীর আদর্শে তারা একাজ করেনি। শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। কিভাবে মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হবে সে সম্পর্কে তাঁদের কোন নির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণা ছিল না। কিন্তু সব সত্ত্বেও তাঁরা মানুষের দুর্দশা ঘোচাতে চেষ্টা করেছেন, সর্বস্ব পণ করে। সেই আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই আমি আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করি। এবং আজও আমি সেই আদর্শ থেকেই আমার অনুপ্রেরণা পাই, কার্ল মার্কসের তিন খন্ড 'ক্যাপিট্যাল' থেকে বা মার্কসবাসীদের লেখা হাজারো বই থেকে নয়। আদর্শবাদী মানুষ স্বাধীনতার সেই প্রাচীন আদর্শ দ্বারাই অনুপ্রেরিত হয়েছে।[১৬]

১৯০৫ সালে নরেনের পিতা দীনবন্ধু মারা যান। মারা যাবার আগে তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র সুশীলকে তিনি বলে যানঃ "দোনার[১৭] অনেক উচ্চ আদর্শ আছে; ওকে দেখো"।[১৮] সুশীল এবং নরেনের অন্যান্য ভাই-বোনেরা তাঁদের পিতার ঐ শেষ ইচ্ছা সর্বতোভাবে মেনে ছিল।

(১৬) এম, এন, রায়—New Orientation ; পৃঃ ১৮৩
(১৭) নরেন ভট্টাছার্য্যের পিতৃদত্ত ডাকনাম।
(১৮) ললিত কুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

দুই ঃ বৈপ্লবিক রাজনীতির শুরু

১৯০৫ সাল। নরেন তখন স্কুলের ছাত্র। বাংলাদেশে বিরাট রাজনৈতিক উত্তেজনার শুরু হয়েছে। এই উত্তেজনা সৃষ্টির আপাত কারণ ছিল তদানিন্তন ইংরাজ বড়লাট বাহাদুর লর্ড কার্জনের বাংলাদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত। এত বড় একটা প্রদেশ এক শাসনের অন্তর্ভুক্ত থাকার অনুপযোগী—এই যুক্তি দেখিয়ে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা পণ করল এই বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে। এই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধিতার আন্দোলনের উপরই বাংলাদেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হয়।[১] বর্ধিষ্ণু রাজনীতিবিদদের পথ এবং সভা সমিতি ও দরখাস্ত মারফৎ শাসকদের মত ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার জন্য উপদেশ পরিত্যাগ করে বাঙ্গালী যুবকরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করল। নয়া জাতীয়তাবোধ এবং হিন্দুধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকদল স্বামী বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিল। বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর যাঁরা তাদের অনুপ্রাণিত করল তাঁরা হচ্ছেন ইতালীর বৈপ্লবিক দার্শনিক ম্যাটর্জিনি (Mazzini) এবং গ্যারিবল্ডী (Garibaldi)। ইতালী, ফ্রান্স এবং আয়ারল্যান্ডের বিপ্লব তাদের পথ-প্রদর্শক হলো। এবং ১৯০৪ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এশিয় শক্তি জাপানের জয়লাভ তাদের উৎসাহিত করল।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশ বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই বৎসরই ১৬ই অক্টোবর তা কার্যে পরিণত করা হয়। বস্তুত বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৪ সালে যখন কার্জন সাহেব ঢাকায় প্রথম এই বিভক্তিকরনের কথা বলেন। দুই বঙ্গের নেতারা তখন থেকেই বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধিতা শুরু করে এবং ক্রমশ সমস্ত বাংলাই এই আন্দোলনে যোগ দেয়।

(১) (তৎকালীন পুলিশ কমিশনার) চার্লস টেগার্ট—ভারতে নাশকতামূলক আন্দোলন (Terrorison in India) [১৯৩২ সালের ১লা নভেম্বর ইংলন্ডে Royal Empire Society তে প্রদত্ত বক্তৃতা] পৃঃ ৭

এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে ১৯০৫ সালের শেষদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম 'বন্দে মাতরম্' গানটি গাওয়া হয় এবং এটি জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। এবং এই ১৯০৫ সালেই ভগিনী নিবেদিতা প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে বক্তৃতা করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে বলেন ঃ এখন প্রত্যেক ভারতীয়ের একমাত্র কর্তব্য হলো স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেওয়া, আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য সাধনা এখন নয়। এবং ১৯০৫ সালেই অরবিন্দ 'ভবানী মন্দির' লেখেন। এই "ভবানী মন্দির"-এ অরবিন্দ বিপ্লবের পথ ও আদর্শ লিপিবদ্ধ করেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ই নরেন আত্মোন্নতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ইন্দ্রনাথ নন্দী এবং অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং কলকাতায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সভা-সমিতিতে যোগ দিতে থাকেন। নরেন সব সময়েই হেঁটে কলকাতা যাতায়াত করত এবং সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও নিয়ে আসতো। তার এইসব সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়াটা স্কুলের নতুন হেডমাস্টার মশায়ের কানে পেঁছায় এবং তিনি নরেনকে এইসব রাজনৈতিক সভা-সমিতির সঙ্গে সংস্পর্শ ত্যাগ করার জন্য বলেন এবং সাবধান করে দেন।

এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের চতুর্দিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সভা করে বেড়াচ্ছিলেন। এই সময়ই সুরেন্দ্রনাথ "ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক" (Father of Indian Nationalism) আখ্যা পান। বাংলাদেশকে বঙ্গমাতা আখ্যা দিয়ে, সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজদের মাতৃহননের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন এবং ইংরাজ শাসকদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন। এই সময় নরেন কোদালিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের একটি সভার আয়োজন করে। কোদালিয়ায় আসার উপলক্ষ্য করে নরেন তার স্কুলেও একটি সভার আয়োজন করে এবং সম্মানিত অতিথি সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করার জন্য একটি মিছিল সংগঠিত করে।

কিন্তু তৎকালীন নূতন হেড়ে মাস্টার মশায়ের কাছে এই সভা অনুষ্ঠান করার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি তা' নামঞ্জুর করেন। পরে, এই সভা ও মিছিল করার জন্য নরেন ও তার সাতজন সঙ্গীকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই সাতজনের মধ্যে হরিকুমার চক্রবর্তী এবং শৈলেশ্বর বসুও ছিলেন।[২] এর কিছুদিন পরেই নরেন হরিকুমারকে বলে ঃ "সভা-সমিতি করে ইংরাজদের তাড়ানো যাবে না। তাদের জোর করে তাড়াতে হবে।"[৩]

(২) হরিকুমার চক্রবর্তী—মানবেন্দ্রনাথ স্মরণে ; পৃঃ ৬

(৩) কালিচরণ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

জীবনের এই সন্ধিক্ষণে কিছু করার জন্য এবং তার একটি উপযুক্ত পথ খুঁজে বের করার জন্য ওরা অস্থির হয়ে উঠেছিল।[৪] এই সময় ওদের হাতে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত "সন্ধ্যা" পত্রিকার একটি সংখ্যা এসে পৌঁছায়। 'সন্ধ্যা'র সম্পাদকীয় ওদের মনকে খুবই প্রভাবিত করে। সম্পাদকীয়টিতে লেখা ছিল "আমরা চাই পূর্ণ স্বাধীনতা। যতদিন দেশে ফিরিঙ্গীদের এতটুকুও আধিপত্য থাকবে ততদিন দেশের কোন মঙ্গল হবে না। যদি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করার কাজে না লাগে তাহলে স্বদেশীয়ানা, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, সবই আমাদের কাছে নিরর্থক।"

এই সময়ই শৈলেশ্বর বসুর কাকা, কেদারনাথ, ওদের স্বামী বিবেকানন্দের "কর্মযোগ" বইখানি দেন। কেদারনাথ বিবেকানন্দ সমিতির সভ্য ছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতার কাছ থেকে বই পত্তর পেতেন। হরিকুমার লিখেছেন "প্রথম হাতে পড়ল স্বামীজীর 'কর্মযোগ'। চোখে পড়ল লেখা আছে—It is better to be attached than to be unattached (নির্লিপ্ত থাকা অপেক্ষা কর্মে নিয়োজিত হওয়াই শ্রেয়)—একি কথা! সন্ন্যাসী বলছেন এ্যাটাচমেন্টের কথা! সারারাত কর্মযোগ পড়লুম—উত্তেজিত হয়ে উঠলুম এমনই যে, রাত্রে ঘুম হল না। কিছুদিন পরে স্বামীজীর 'বর্তমান ভারত' পেলুম। এবার আমাদের জীবনের গতি ঠিক হয়ে গেল। স্বামীজীর কর্মসন্ন্যাসই আমাদের আদর্শ। কর্মত্যাগের সন্ন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন মতের কথা শুনেছি। যতীন মুখার্জীর (বাঘা যতীন) সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। চোখের সামনে ভাসছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা যা হইবেন' সেই স্বপ্ন। বিবেকানন্দের 'কর্মযোগ', 'বর্তমান ভারত' দিল আমাদের অনুসরণের আদর্শ আর কর্মপন্থা।"[৫]

এই সময় রামদাস বাবাজী নরেন ও হরিকুমারকে ডেকে পাঠান। "রামদাস বাবাজী ডেকে পাঠালেন, সারা রাত বোঝালেন, কিন্তু কিছু হলো না, স্বামীজীর পথই আমাদের পথ—আমাদের দেবতা আমাদের দেশ"[৬]। এর পরই নরেন ও হরিকুমার বেলুড় মঠে স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দেখা করে। সারদানন্দ তখন অনুশীলন সমিতিতে গীতা পড়ান। সারদানন্দই ওদের অনুশীলন

(৪) হরিকুমার—পৃঃ ৭

(৫) বিপ্লবী আন্দোলনে স্বামীজীর প্রভাব—হরিকুমার চক্রবর্তী; বিশ্ববিবেকে প্রকাশিত; পৃঃ ২৫৪

(৬) ঐ—পৃঃ ২৫৪

সমিতির সম্পাদক সতীশ বোসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে ওরা দুজনে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সতীশ বোসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।[৭] ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ডঃ ভূপেন দত্তের "অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাসে" লিখেছেন ঃ "নরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতিতে। তার সঙ্গে হরিকুমার চক্রবর্তীও ছিলেন" (পৃঃ ১৯৭)।

১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে নরেন এবং হরিকুমার অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৪৯নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটেই বসবাস করতে শুরু করে এবং সেখান থেকে চাংড়িপোতায় যাতায়াত করে। কয়েক মাসের মধ্যেই ওরা চাংড়িপোতায় অনুশীলন সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে একটি দল তৈরী করে। ১৯০৭ সালে চাংড়িপোতায় ওরা একটি লাঠি খেলা, কুস্তী ইত্যাদি ব্যায়াম চর্চার বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিন দাস লাঠিখেলা দেখান।

অনুশীলন সমিতিতে থাকাকালীন নরেন বিপ্লব সম্বন্ধে এবং বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা করে, এবং গ্যারিবল্ডি, ম্যার্টসিনি এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের জীবনী পড়ে। এই সময় নরেন অনুশীলন সমিতির সংগঠনকে বাড়াবার জন্য কাজ করতে থাকে। যতীন মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী নলিনী কর প্রথম ১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতির কার্যালয়ে নরেনের সহিত পরিচিত হন। নরেনের সঙ্গে নলিনী করের পরিচয় করিয়ে দিয়ে সতীশ বসু বলেন "নরেন এইমাত্র মালদা থেকে সমিতির কাজ সেরে হেঁটে ফিরেছে"।[৮]

প্রায় এক বছর পর, নরেন, হরিকুমার এবং অন্যদের উপর থেকে স্কুলের বহিস্কারের আদেশ তুলে নেওয়া হয় এবং ওদের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয়। অন্যান্য ছেলেরা পরীক্ষা দেয় ; কিন্তু নরেন ও হরিকুমার পরীক্ষার ফি-এর টাকাটা জমা না দিয়ে, সেই টাকা সম্বল করে অনুশীলন সমিতির হয়ে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের ত্রানকার্যে যোগ দিতে চলে যায়। উড়িষ্যার ত্রানকার্যে তাদের নিষ্ঠা এবং কর্মক্ষমতা দেখে সমিতির সকল নেতাই মুগ্ধ হয়ে যান এবং তারপরই ওদের অনুশীলন সমিতির গোপন সংস্থায় নেওয়া

(৭) M. N. Roy ঃ জীবন ও দর্শন (বাঙ্গলা পুস্তিকা)—মুকুন্দলাল সরকার কর্তৃক ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত ; পৃঃ ৪

(৮) নলিনী করের সহিত লেখকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

হয়।[৯] এই গোপন সংস্থায় ভর্তি হওয়ার সময় নতুন সভ্যকে গীতা হাতে ধরে —গীতার উপর একটি তরোয়াল রক্ষিত থাকবে—হোমের আগুনের সামনে অথবা কালীর সামনে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরণ লড়াই করার প্রতিজ্ঞা নিতে হয়। এবং প্রতিজ্ঞা নেওয়ার সময় নিজের রক্ত দিয়ে নাম লিখতে হতো। নরেন ও হরিকুমার রক্ত দিয়ে নাম লিখতে অস্বীকার করে। সতীশ বোসকে নরেন বলে "আমার প্রতিজ্ঞার দাম কি রক্তের চেয়ে কম ?"[১০] এবং রক্ত দিয়ে নাম না লিখেই নরেন ও হরিকুমার অনুশীলন সমিতির গোপন সংস্থার সভ্য হিসাবে ভর্তি হয়।

উড়িষ্যাতে নরেনকে জয়পুরের রুরিয়াহাট ক্যাম্পের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই ক্যাম্পের অধীনে ১২টি কেন্দ্র ছিল। এই ক্যাম্পে হরিকুমার অসুস্থ হয়ে পড়ায় সতীশ বোস হরিকুমারের জায়গায় ডাঃ অশ্বিনী রায়কে পাঠান। অশ্বিনী রায় অনুশীলন সমিতির পুরাতন সভ্য। অশ্বিনী রায় লেখককে বলেন ঃ "রুরিয়াহাটে থাকার সময় নরেনকে দেখলুম একদিন কিছুই খেল না। সেদিন পূর্ণিমা। সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের খাওয়া দাওয়া শেষ হল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে—নরেনকে দেখলুম বাঁধের দেওয়ালের উপরে উঠে বসতে। বহুক্ষণ সেখানে চাঁদের ওপর স্থির দৃষ্টি রেখে নরেন যোগাসনে বসে আছে। পলক পড়ছে না। আমি নরেনের কাছেই দাঁড়িয়েছিলুম। যখন যোগাসন থেকে নীচে নেমে এল, আমি নরেনকে জিজ্ঞাসা করলুম : "এর উদ্দেশ্য কি ? নরেন প্রথমে কিছুই বলতে চায় না। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর নরেন বলে ঃ 'অশ্বিনী, আমি অত্যন্ত দরিদ্র ঘরে জন্মেছি। পৃথিবীর বহুস্থানে বহু বিখ্যাত লোক আছে—আমি হয়তো কোনওদিনই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো না। তাই পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি। যদি সেই সব মহান ব্যক্তিরাও সেই সময় চাঁদের দিকে তাকায় তাহলে চাঁদের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে একটা সংযোগ হবে'।"[১১]

অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই নরেনের বিপ্লবী সাংবাদিকতার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। ৪৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে থাকার সময় নরেন প্রায়ই "বেঙ্গলী" (Bengali) পত্রিকার তৎকালীন সহ-সম্পাদক কাশীনাথ রায় (পরে ইনি লাহোরের Tribune পত্রিকার সম্পাদক হন) এবং

(৯) শরৎচন্দ্র ঘোষের সহিত সাক্ষাৎকার।

(১০) কালিচরণ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎকার।

(১১) ডাঃ অশ্বিনী রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী হইতে।

"নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার পঞ্চানন মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে পটলডাঙ্গার শশাঙ্ক জোয়ারদারের বাড়ীতে যেতো।[১২] যদিও নরেন ঐ সব পত্রিকায় কিছু লিখেছেন কিনা সঠিক জানা যায় না ; তবে ১৯০৭ কিংবা ১৯০৮ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় নরেন একটি প্রবন্ধে লেখে ঃ "জনতার বাণীই ভগবানের বাণী" ; এবং উপসংহারে লেখে ঃ "একমাত্র ভারতের জনগণেরই অধিকার তাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করার। ইংরাজরা জোর করে ভারতবাসীর উপর তাদের শাসন চাপিয়ে দিয়েছে। ভারতের জনগণের উপর ইংরাজদের রাজত্ব করার কোন অধিকারই নেই। সেই অন্যায় শাসনকে অস্বীকার করার এবং দেশ থেকে সেই শাসনের অবসান ঘটানোর জন্মাধিকার প্রত্যেক ভারতবাসীর আছে"।[১৩] এই সময় নরেন প্রচুর পড়াশুনাও করে এবং নরেনকে সেই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে একজন পড়াশুনা করা যুবক হিসাবে গণ্য করা হতো। এবং তখন থেকেই বিপ্লবীদের মধ্যে নরেনকে বুদ্ধিমান এবং সাহসী বলে অনেকেই শ্রদ্ধা করতে শুরু করে।[১৪]

কিছুদিন পরের একটি ঘটনায় নরেনের সম্মান বিপ্লবীদের মধ্যে এবং বিশেষ করে সতীশ ঘোষের কাছে আরও বেড়ে যায়। এই ঘটনাটি ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্ধোদয় যোগের সময় ঘটে। অর্দ্ধোদয় যোগের সময় বহু তীর্থযাত্রী, বিশেষ করে মহিলারা, দূর দূর জায়গা থেকে কলকাতায় আসে গঙ্গায় স্নান করার জন্য। অনুশীলন সমিতির বহু স্বেচ্ছাসেবক এদের সাহায্য করার কাজে যোগ দেয়। হঠাৎ অনুশীলন সমিতির কার্যালয়ে খবর আসে যে ইংরাজ সৈনিকরা মহিলা তীর্থযাত্রীদের ছড়ি দিয়ে অশ্রদ্ধভাবে সরিয়ে দিচ্ছে এবং মহিলা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে। সতীশ বোস ভয়ানক রেগে যান। ডাঃ অশ্বিনী রায় বলেন ঃ সৈন্যদের উপর দূর থেকে গুলি চালানো যাক। নরেন তখন বলে গুলি চালালে তার প্রতিক্রিয়া খারাপ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং মিলিটারী

---

(১২) শরৎচন্দ্র ঘোষের সহিত সাক্ষাৎকার। শরৎচন্দ্র ঘোষ মনে করতেন যে এই সময় নরেন ঐ পত্রিকা দুইটিতে কিছু কিছু লিখতেনও।

(১৩) নির্বান স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার। নির্বান স্বামী মন থেকেই এই লাইনগুলি বলে যান। যুগান্তর পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি সংগ্রহ করা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে আরও দু'একজন ঐ লেখাটি যে নরেনের এবং সেটি যুগান্তরে প্রকাশিত হয়েছিল তা বলেন।

(১৪) শ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষের সহিত সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে।

তাদের অত্যাচার তো বাড়াবেই, সরকারও অনুশীলন সমিতির সভ্যদের সন্দেহ করে তাদের নিপীড়ন করবে।

নরেন চারজন সাহসী ও শক্তিমান স্বেচ্ছাসেবক চায়। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছোট লাঠি তাদের শার্টের আস্তানার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ওর সঙ্গে আসতে বলে।[১৫] এই চারজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন অশ্বিনী রায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রসিকলাল দত্ত এবং নগেন দত্ত। এঁদের সঙ্গে নরেন এসপ্ল্যানেড এলাকায় যায় এবং প্রথমে সৈনিকদের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিযোগ যাচাই করে। তারপর তার সঙ্গীদের ঐ সৈনিকদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে তার নিশানার অপেক্ষা করতে বলে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা পাঁচ জনে পাঁচটি সৈনিকের মাথার পিছন দিকে কানের ঠিক পেছনে জোরে একটি করে লাঠির ঘা মেরে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ে। অন্য যে সব স্বেচ্ছাসেবকরা ঘটনাটির প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল তারা পরে বলে ঐ পাঁচজন সৈনিক অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের সকলকেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। সৈনিকদের তৎক্ষণাৎ ঐ এলাকা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তারপর আর কোন অশোভন ঘটনা ঘটে নি।

নরেনের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে সতীশ বোস সেদিন বলেন : "নরেন, একদিন তুমি আমাদের মধ্যে একজন কেউকেটা হবে।"[১৬]

(১৫) অনেক বিপ্লবীর কাছে (ভূপতি মজুমদার এবং আরও অনেকে) শুনেছি নরেন ছোট লাঠি খেলায় খুবই ওস্তাদ ছিলেন।

(১৬) ডাঃ অশ্বিনী রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

তিন ঃ যতীন মুখোপাধ্যায়

সার্কুলার রোডের ঘাঁটি, ইস্ট ক্লাব, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও বারীন ঘোষের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়। সে-কারণে যতীন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে সার্কুলার রোডের আস্তানা ছেড়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে একটি মেস বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। এখান থেকেই যতীন্দ্রনাথ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যভূষণের সহযোগীতায় তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। এই যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই ম্যাটসিনি এবং গ্যারিবল্ডির জীবনী বাংলায় লেখেন। এঁর বাড়ীতে স্বামী বিবেকানন্দ যাতায়াত করতেন এবং সদর ঘরে লিখে গিয়েছিলেন ১৯২৫ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।[১] বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ম্যাটসিনি এবং গ্যারিবল্ডির জীবনী বিপ্লবীদের মধ্যে খুবই প্রিয় ছিল এবং অনুশীলন সমিতির রাজনৈতিক শিক্ষা ক্লাসে পড়ানো হতো। যতীন্দ্রনাথকে অরবিন্দ খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন।[২] যতীন্দ্রনাথ এবং বারীনের অনুরোধেই অরবিন্দ ১৯০৩ সালে কলকাতায় আসেন, ওঁদের বিরোধ মেটাতে। এই সময় অরবিন্দ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ীতে থাকেন।

অরবিন্দ কলকাতা থাকার সময় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের পুত্র শচীন্দ্র-নাথ যতীন মুখোপাধ্যায়কে অরবিন্দর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শচীন্দ্রনাথ

(১) বিশ্ববিবেক ঃ হরিকুমার চক্রবর্তীর "বিপ্লবী আন্দোলনের স্বামীজীর প্রভাব —পৃঃ ২৫৩।

(২) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এই লেখকের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় বলেন ঃ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বরোদা থাকাকালীন অরবিন্দকে বিপ্লবী রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং রাজনীতিতে টানতে সমর্থ হন বলেও ডাঃ মুখোপাধ্যায় দাবী করেন।

(৩) শোভাবাজার রাজবাটীতে একটী সম্বর্ধনা সভায় যতীন মুখোপাধ্যায় প্রথম স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হন। পরে কলকাতা প্লেগ মহামারীর সময় যতীন মুখোপাধ্যায় স্বামীজীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হন—ত্রাণকার্যের মাধ্যমে।

অম্বর গুহের আখড়ায় যেতেন এবং সেখানেই যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন। যতীন মুখোপাধ্যায় যখন অরবিন্দের কাছে আসেন, তখন অরবিন্দ তাঁকে তাঁর তিন-দফা বৈপ্লবিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলেন। এই পরিকল্পনা হলো ঃ

১। (ক) যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চা এবং অস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা শুরু করা।

(খ) বিভিন্ন স্থানে গোপন সংগঠন গোড়ে তুলে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার করা।

(গ) সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি করা।

২। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীদের উদ্বুদ্ধ এবং সচেতন করা এবং তার জন্য পুস্তিকা, পত্রিকা এবং সভা-সমিতির মারফৎ প্রচার করা।

৩। জন প্রতিষ্ঠান গঠন করে তার মাধ্যমে অসহযোগ (Non-co-operation), নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন (passive resistance), বিদেশী দ্রব্য বর্জন (boycott of foreign goods) এবং রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র গঠন করা (building up of state within state)।

অরবিন্দ আরও বলেন ঃ বিদেশী প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন, জনগণের নিজস্ব আদালত গঠন করে বিচার ব্যবস্থা প্রচলন, নতুন আইন প্রনয়ন এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে তাকে ক্রমশ জাতীয় সৈন্যে পরিবর্ধিত করা—এ সবেরই প্রয়োজন।

নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস লাভ করতে চাইছিলেন। অরবিন্দের নেতৃত্বে চরমপন্থীরা আরও এগিয়ে গেলেন, তাঁরা ব্রিটিশ রাজের শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁদের লক্ষ্য স্থির করলেন।

এই চিন্তাধারার মূল প্রবক্তা এবং তাত্ত্বিক হিসাবে অরবিন্দ হিংসাত্মক সংগ্রামের পথের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন ; তবে সেই সঙ্গে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রেরিত করার জন্য অহিংস পন্থার প্রয়োজনীয়তার

যতীন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন ঃ একজন যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন যার একমাত্র আদর্শ ছিল স্বামীজীর নামের চারিপাশে ভারতীয় যুবকদের সংগঠিত করা (২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালের সাপ্তাহিক বসুমতিতে পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনা থেকে)।

কথাও বলেন। এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের আদর্শ প্রথম অরবিন্দই 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় প্রচার করেন। অবশ্য অরবিন্দ এবং বিপিনচন্দ্র পাল দু'জনেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পথ হিসাবে নয়।

যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন বিপ্লবের আদর্শ এবং পথ নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তখন অরবিন্দ বলেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য অনেক বিদেশী শক্তি এগিয়ে আসবে। এই সব কথাবার্তার পর যতীন মুখোপাধ্যায় অরবিন্দের বিশেষ ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং তাঁর উপদেশ মত অস্ত্র, অর্থ এবং বিপ্লবের উপযুক্ত মানুষ সংগ্রহ করতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[৪]

এর কিছুদিন পরেই যতীন মুখোপাধ্যায় "ছাত্র-ভাণ্ডার" বলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েন। এর মধ্যে ছিলেন নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, কার্তিক দত্ত, ইন্দ্রনাথ নন্দী, পবিত্র দত্ত এবং আরও অনেকে। এইসব স্বেচ্ছাসেবক অনুশীলন সমিতির বিভিন্ন শাখা থেকে সতীশ বোস পাঠান। "ছাত্র ভাণ্ডার" ছাত্রদের সমবায় সংস্থা হিসাবে গঠিত হয় এবং এটি বিপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষার কাজে একটি বিশেষ মূল্যবান সংস্থা হয়ে ওঠে। যতীন মুখোপাধ্যায় নিজে বাংলা সরকারের স্টেনোগ্রাফারের চাকরী করতেন এবং সেই সুযোগে তিনি অনেক কিছু গোপন তথ্য জানতে পারতেন। 'ছাত্র ভাণ্ডার' মারফৎ তিনি বিপ্লবীদের সরকারের তাদের সম্বন্ধে নির্দেশ আগে থাকতেই জানিয়ে দিতেন যাতে বিপ্লবীরা সাবধান হয়ে যায়।

১৯০৭ সালের প্রথমদিকে নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয় তার নিকটাত্মীয় ফণী চক্রবর্তী মারফৎ এবং ক্রমশ নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়ের একজন বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠে।

বারীন ঘোষ যখন মানিকতলায় মুরারীপুকুর গার্ডেনস্-এ তাঁর বোমা তৈরীর কেন্দ্র স্থাপন করে তখনও নরেন বারীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। এই সময় বারীন অরবিন্দের নেতৃত্বে নিজস্ব একটি দল গঠন করেন।[৫] যতীন মুখোপাধ্যায়ও ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় দুটি ঘটনা ঘটে।

বারীন যতীন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং হঠাৎ একদিন মন্তব্য করেন "সরকারী কর্মচারী কি করে বিপ্লবী হবে ?"[৬] যতীন মুখোপাধ্যায়ের কানে এই মন্তব্যটি পেঁছায়। এবং তারপর থেকে মর্মাহত যতীন মুখোপাধ্যায় মানিকতলায় যাওয়া বন্ধ করে দেন।

এই সময় বারীন তাঁর কোন শিষ্য অন্য কোন নেতার কাছে, বিশেষ করে যতীন মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যায় এটা অপছন্দ করতে থাকেন। তখন যতীন মুখোপাধ্যায়ও যুবকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এর কারণ ছিল যতীন মুখোপাধ্যায়ের স্নেহপ্রবণতা এবং সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে থাকা। তাছাড়া আর একটি জিনিষ যতীন মুখোপাধ্যায়কে যুবকদের কাছে প্রিয় করেছিল, সেটি তাঁর শারীরিক শক্তি। কোন অস্ত্র না নিয়েই তিনি একবার একটি বাঘ মেরেছিলেন—এটাই ছিল তার শারীরিক শক্তির একটি বিশেষ পরিচয় যে জন্য তিনি "বাঘা যতীন" বলে পরিচিত হন।

'৯০৭ সালে নরেনের সম্পর্কীয় ভাই ফণী চক্রবর্তী দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরে আসে। দার্জিলিং-এ থাকার সময় ফণী চক্রবর্তী যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়। যতীন মুখোপাধ্যায় ফণী চক্রবর্তীকে চাংড়িপোতায় নরেন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন। ফণী চক্রবর্তী কলকাতায় ফিরে নরেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে এবং নরেনের সঙ্গে বারীনের গুপ্ত আড্ডায় ও যাতায়াত শুরু করে। কিন্তু ফণী যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখে। এতে বারীন রেগে যান এবং একদিন ফণীকে যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সংস্রব না রাখার জন্য আদেশ দেন। ইতিমধ্যে যতীন মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বারীনের মন্তব্য অরবিন্দের কানে পেঁছায় এবং এই মন্তব্যের জন্য অন্যান্য বিপ্লবীদের মধ্যেও কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়। অরবিন্দ যতীন মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন; তিনিও ঐ মন্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। বারীন ফণীকে তিরস্কার করার পর, নরেনও যতীন মুখোপাধ্যায়কে আরও ভাল করে জানবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং ফণীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে। তারপরই নরেন বারীনের সঙ্গে তার যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন করে যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়।

---

(৬)

এ সম্পর্কে নরেন নিজেই পরে লেখে ঃ

"একটি কথোপকথনের কিছুটা আমি শুনতে পাই। আমি তখনও অন্য এক 'দাদা'র দলভুক্ত এবং শুনতে পেলাম তিনি তাঁর এক চেলাকে ধমকাচ্ছেন তার দ্বিধাগ্রস্থ আনুগত্যের জন্য। এই চেলার অপরাধ সে অন্য এক দাদার কাছেও যাতায়াত করছিল। শেষকালে ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে চেলাটি বলে ঃ 'দাদা, কেন আপনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বারণ করছেন ? তিনি তো আমাকে তাঁর দলভুক্ত হওয়ার কথা বলেন নি ; তাঁর তো কোন দলই নেই'। এই অদ্ভুত দাদা সম্পর্কে জানবার কৌতূহল আমার বেড়ে গেল। এই গুরুভাইকে যখন তার 'দাদা' ধমক ধামক দেওয়া শেষ করলো আমি তার সঙ্গে আলাদা দেখা করলুম। পরের দিন এই গুরুভাই আমাকে সেই অন্য দাদা'র কাছে নিয়ে গেল, যে দাদা ছেলে ধরার জন্য ব্যস্ত নয়। এবং আমি চিরকালের মত সেই দাদার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। সেই সময় আমি ভাল করে বুঝিনি কি আকর্ষণ তাঁর ছিল...পরে আমি বুঝেছি তাঁর কি গুণ আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। সেটি তার ব্যক্তিত্ব। তারপর এ যুগের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এঁরা সবাই বিশ্ব বিখ্যাত এবং মহান ব্যক্তি। কিন্তু যতীনদা ছিলেন সৎ মানুষ এবং আজও আমি এরকম একজন সৎ মানুষ পাইনি। সমস্ত দাদারাই আকর্ষণ করার চেষ্টা করতো ; শুধু যতীন মুখাজীর মধ্যেই সেই আকর্ষণীয় শক্তিটি ছিল"।[৭]

যতীন মুখোপাধ্যায়ই নরেন, হরিকুমার এবং ফণীকে বলে সমাজসেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে এবং সমাজসেবার মাধ্যমে গোপনে বিপ্লবের

(৭) এম, এন, রায় লিখিত "যতীন মুখাজী" (ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়ায় ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে)

১৯৪৯ সালে যতীন মুখাজী স্মারক কমিটি র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টীর নেতাদের ঐ কমিটিতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানান। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে এম, এন, রায় (নরেন ভট্টাচার্য) জাতীয়তাবাদী নাশকতামূলক বিপ্লব সম্পর্কে তার বিরোধীতা বহুভাবে প্রকাশ করেন। সেজন্য এই নিমন্ত্রণের কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বে বাংলা দেশের পার্টী এম, এন, রায়কে তাঁর মতামত জানাতে বলে। উত্তরে এম, এন, রায় যতীন মুখাজী সম্পর্কে এই শ্রদ্ধাপূর্ণ রচনাটি লেখেন। বহু র‍্যাডিক্যাল প্রথমে খুব বিস্মিত হয়, পরে তারা এম, এন, রায় সম্পর্কে আরও ভাল করে জানতে পারে। লেখক ॥

প্রস্তুতি করতে।[৮] যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কিছুদিন পরেই নরেন ও হরিকুমার বাংলা দেশের বাঁকুড়া জেলার ছেদাপাহাড় পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে বন্দুক ছোঁড়ায় শিক্ষানবিশী করে। এবং অল্পদিনের মধ্যে ওরা ৪০/৪৫ জনের একটি দল তৈরী করে ফেলে যারা সবাই স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নেয়। এই দলে ছিলেন খিদিরপুরের ডাঃ শরৎ মিত্র, চেতলার চারু ঘোষ, ন্যাতড়ার (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) হেম সেন ইত্যাদি। চেতলার একজন মুসলমান ভদ্রলোক, নুর মহম্মদ, বন্দুক মেরামতের কাজে দক্ষ ছিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা করতেন, তিনি এই দলকে বেশ কিছু বন্দুক বিক্রয় করেন। এইসব বন্দুক চেতলার চারু ঘোষের বাড়ীতে রাখা হতো। পরে সুন্দরবন অঞ্চলেও এঁরা বন্দুক ছোঁড়া শিখতে এবং শেখাতে যেতেন।[৯]

(৮) অলক চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(৯) ঐ

চার ঃ স্বদেশী ডাকাতি এবং রাজনৈতিক হত্যা

১৯০৬ সালের মাঝামাঝি থেকেই বারীন অনুশীলন সমিতির লাঠি খেলার সংগঠন ও প্রচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তখনই বারীন ঠিক করেন যে বৈপ্লবিক প্রচার এবং কার্যকলাপের মাধ্যমেই দেশে বৈপ্লবিক চেতনা আনতে হবে। বারীন এবং তাঁর সহযোগিরা সেই সময় 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয় বিপ্লব প্রচারের জন্য। এর থেকে বারীন এবং প্রমথ মিত্র মহাশয়ের মধ্যে মতদ্বৈধতা শুরু হয়। ১৯০৬ সালের মার্চ মাসে বারীন, দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং ভূপেন দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বারীনের দলের সঙ্গে প্রথম মিত্রের ঝগড়া মেটাবার জন্য সুবোধ মল্লিক মহাশয়ের বাড়ীতে একটি সারা বাংলা বিপ্লবী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের পর প্রথম মিত্র মহাশয় বারীনের পত্রিকাকে সমর্থন করতে সম্মত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুই দলের ঝগড়া বেড়েই চলতে থাকে। প্রমথ মিত্র মনে করতেন যে সর্বত্র উপযুক্ত বিপ্লবী সংগঠন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহ ঘোষণার কথা চিন্তা করা অর্বাচীন কাজ হবে। তিনি আরও মনে করতেন যে, প্রস্তুতি না করে কোনরকম কাজ করলে যতটুকু সংগঠন হয়েছে তাও ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে।

এর কিছুদিন পরই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারীনের সঙ্গে ক্রমাগত ঝগড়ার ফলে কলকাতা ছেড়ে চলে যান। এই সময় যতীন্দ্রনাথ উত্তর প্রদেশ এবং পাঞ্জাব ভ্রমণ করেন এবং সর্দার অজিত সিং এবং আরও অনেককে বিপ্লবী রাজনীতিতে অনুপ্রাণিত করেন। যতীন্দ্রনাথ এই সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নিরালম্ব স্বামী নামে পরিচিত হন।

যতীন মুখার্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এই সময় মারা যায় এবং তিনি ও সন্ন্যাস নেবার উদ্দেশ্যে হরিদ্বার যান। হরিদ্বারে যতীন মুখার্জী ভোলানন্দ গিরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভোলানন্দ গিরি তাঁর গুরু ছিলেন। ভোলানন্দ গিরি ওঁকে পুনরায় রাজনীতিতে ফিরে যাবার জন্য উপদেশ দেন। ভোলানন্দ

গিরিই যতীন মুখাজীর্কে বলেন ঃ "তোমায় এখনও দেশের জন্য অনেক কাজ করতে হবে"। ভোলানন্দ গিরির আশ্রমে তখন অনেক বিপ্লবীই আশ্রয় নিতেন এবং পরে তাঁরা ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যতীন মুখাজী এই সময় নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গেও দেখা করেন এবং তাঁর কাছে রাজনৈতিক শিক্ষা নেন। যতীন মুখাজী পরে তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিরালম্ব স্বামীর পরামর্শ নিতেন। হরিদ্বার থেকে ফিরে এসেই যতীন মুখাজী বিপ্লবী কাজকর্মে আরও মনোনিবেশ করেন। এবং তখনই তিনি বারীনের বোমা তৈরীর কেন্দ্রের সঙ্গেও যুক্ত হন এবং ইংরাজদের সশস্ত্র বিপ্লব মারফৎ তাড়ানোর জন্য বিভিন্ন দল সংগঠন করতে শুরু করেন।

ইতিমধ্যে নরেনও বারীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছে। বারীনের সঙ্গে ওর পরিচয় পূর্বেই হয় আরবেলিয়ার অবিনাশ ভট্টাচার্যের মারফৎ। নরেন তখনও অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করেনি, যদিও এই সময় এবং ১৯০৭ সালেও নরেন বারীন এবং অবিনাশের সঙ্গে ভবানী দত্ত লেনের একটি মেসে থাকতে শুরু করে।[১] বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯০৭ সালে, অরবিন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত নরেন অরবিন্দর সঙ্গে একই বাড়ীতে থাকতেন।[২] ভবানী দত্ত লেনে 'ছাত্র ভান্ডার' পরিচালিত মেসে থাকার সময়ই অরবিন্দের অনুপ্রেরণায় নরেন 'মায়ের ডাক' নামে একটি বাংলা পুস্তিকা লেখে। চাংড়ীপোতা রেল স্টেশন ডাকাতি করার পর নরেন যখন গ্রেপ্তার হয় সেই সময় পুলিশ ঐ পুস্তিকাটি নরেনের পকেট থেকে পায়[৩] এবং সেটি বাজেয়াপ্ত করে। এই পুস্তিকাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে পরিশিষ্ট হিসাবে দেওয়া হইল।

ইতিমধ্যে নরেন বোমা তৈরী করতেও শিখে গেছে। এবং তখন নরেনও এই মত পোষণ করতে শুরু করেছে যে শুধু লাঠিখেলা শিখিয়ে দেশ স্বাধীন করা যাবে না। ফলে অনুশীলন সমিতির প্রমথ মিত্র এবং সতীশ বোসের সঙ্গে তারও মতদ্বৈধতা শুরু হয়। এই সময় নরেন ডাঃ অশ্বিনী রায়কে একদিন বলে ঃ "দেখ অশ্বিনী, এই সব পথ ঠিক নয়। দেশকে স্বাধীন করতে হলে আমাদের নতুন পন্থা নির্ধারণ করতে হবে।"[৪] তখন থেকে নরেন বিপ্লবের

(১) পূর্ণচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(২) নরেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে গোয়েন্দা দপ্তরের 'ইতিহাস' নং ৬৮৭।
(৩) হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিসের চার্জসীট থেকে এটি জানা যায়।
(৪) ডাঃ অশ্বিনী রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

রাজনীতি এবং পথ সম্বন্ধে আরও বেশী করে অধ্যয়ন করতে শুরু করে এবং কি করে বিপ্লবের দ্বারা দেশকে বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত করা যায় তা জানবার ও শেখবার চেষ্টা করেন; এবং সেই পথ নির্ধারণ করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। নরেন তখন অরবিন্দের তিন দফা কর্মসূচী সম্বন্ধে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে এবং উৎসাহিত হয়। যতীন মুখার্জীর কাছ থেকে নরেন এই তিন দফা কর্মসূচী সম্পর্কে অবহিত হয়। তখন থেকেই নরেন অন্যান্য নেতাদের চেয়ে যতীন মুখার্জীকেই বেশী শ্রদ্ধা করতে শুরু করে এবং দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। ফণী চক্রবর্তীর সঙ্গে যতীন মুখার্জীর কাছে যাওয়ার পর যতীন মুখার্জীর সঙ্গে নরেনেব রাজনৈতিক সম্পর্ক চিরকালের মত সুদৃঢ় হয়।

১৯০৭ সাল নাগাদই প্রথম খবর আসে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান থেকে অস্ত্র সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সময়েই 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' এবং 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা মারফৎ বিপ্লবীদের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয় এবং এই সব অনুপ্রেরণা থেকে বিপ্লবীরা তখন বিপ্লবের প্রয়োজনীয় অর্থ তোলার জন্য স্বদেশী ডাকাতি শুরু করে। অবশ্য হত্যা এবং ডাকাতির ব্যাপারে বিপ্লবীদের মধ্যে বিভিন্ন মত ছিল। অনেক বিপ্লবীই সরকারকে অচল করার জন্য রাজনৈতিক হত্যা সমর্থন করতেন কিন্তু যতীন মুখার্জী বলতেন আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যাতিরেকে কাহাকেও, সে বিদেশী আমলা হলেও, হত্যা করা অনুচিত। তাছাড়া যতীন মুখার্জী তখনও পুরো-পুরি ডাকাতি করে অর্থভান্ডার তৈরী করার পক্ষে ছিলেন না। যতদূর জানা যায় দুবার যতীন মুখার্জী ডাকাতির পক্ষে মত দিয়েছিলেন, একবার ১৯০৮-৯ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯১৪ সালে তাঁকে বিপ্লবী সংগঠনগুলির সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করার পর। সতীশ চক্রবর্তী লেখককে বলেন রাজনৈতিক হত্যা এবং ডাকাতির ব্যাপারে নরেনের মনে কোন রকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না।[৫] রাজ-নৈতিক হত্যা এবং ডাকাতি নরেনের কাছে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল এবং এতে তার মন কোনরকম বিচলিত হ'ত না। অন্যদিকে, ডাঃ যাদুগোপাল মুখো-পাধ্যায় একমাত্র তখনই ডাকাতি এবং হত্যা সমর্থন করতেন যখন ইংরেজ আমলাকে হত্যা করা হতো বা ইংরেজদের টাকা ডাকাতি করা হতো। সেজন্য বিপ্লবীদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট একটি মত বা পথ ছিল না;

(৫) সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

তাই রাজনৈতিক হত্যা এবং ডাকাতির ব্যাপারটা খুব একটা পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে হতো না।

১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে হুগলী জেলার চন্দননগর এবং মানকুন্ডুতে পূর্ব ভারত রেলওয়ের উপর দুটি বোমা ছোঁড়া হয়—দুটিরই উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্ণরের ট্রেন ধ্বংস করা। ঐ সালেই ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে গভর্ণরের ট্রেনটি রেললাইন থেকে বিচ্যুত করতে বিপ্লবীরা সমর্থ হয়। এই সময় বিপ্লবীরা চন্দননগর থেকে গোলা বারুদ এবং অস্ত্র জোগাড় করেছিল। চন্দননগরে তখন ফরাসী রাজত্ব, তাই সেখান থেকে বিপ্লবীদের এসব আনার বিশেষ অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে চন্দননগরের পৌরপাল এক অর্ডিনান্স জারী করে এটি বন্ধ করে দেয়। তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯০৮ সালে ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের পৌরপালের বাড়ীর উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়।

এই সময় বিপ্লবীদের বোমা তৈরী করার জন্য এবং অস্ত্র ও গোলা বারুদ কেনবার জন্য অর্থের প্রয়োজন বাড়তে থাকে। সে কারণ কয়েকটি ডাকাতি করা ঠিক হয়। এর মধ্যে প্রথম ডাকাতিটি করে নরেন—চাংড়িপোতা রেল স্টেশনে ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর। এই ডাকাতিতে রেল স্টেশনের লোহার সিন্ধুক ভেঙ্গে প্রায় ৭০০ টাকা পাওয়া যায়। এই ডাকাতি করার সন্দেহে পুলিস যখন পরে নরেনকে গ্রেপ্তার করে তখন তার কাছ থেকে "মায়ের ডাক" নামে পুস্তিকার পান্ডুলিপি (manuscript) এবং বারীন ঘোষের লেখা "বর্তমান রাজনীতি" পাওয়া যায়।[৬] চাংড়িপোতায় তখন নরেন সমাজসেবী হিসাবে এত সুনাম অর্জন করেছিল যে ঐ মামলায় নরেনকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর, সরকার আর মামলাটি চালায় না[৭]। জামিনের দরখাস্তে নরেনের

(৬) Calcutta Weekly Notes ; Vol. V, p. 618.

(৭) 'জাগরণ ও বিস্ফরণ' এর লেখক কালীচরণ ঘোষ লেখককে এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, কোদালিয়া, চাংড়ীপোতা এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির লোকেরা "নরেনদা" এবং "হরিদা"-কে এত শ্রদ্ধা করতো যে ওঁরা যে পথ দিয়ে যেতেন গ্রামের লোকেরা সেই পথের ধুলো মাথায় দিত। এঁদের সমাজসেবার সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীঘোষ বলেন চাংড়ীপোতার শাঁখারী পাড়ায় অম্বিকা মিত্র ও তাঁর পরিবারের ৮ জন থাকতেন। ওঁদের সকলের একদিন কলেরা হয়। পরিবারটি খুবই দরিদ্র এবং সাহায্য করার কেউ ছিল না। নরেনদা, হরিদা ও শৈলেশ্বরদা ঐ বাড়ীতে গিয়ে কয়েকদিন ধরে এদের সেবা

পক্ষে উকিল বাবু প্রমথ নাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন : "যুবক বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের (Bengal Technical Institute) ছাত্র এবং ন্যাশন্যাল কলেজ, যাদবপুর, থেকে স্বর্ণপদক পেয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।"

চাংড়িপোতার ডাকাতি করার পরেই নরেন কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিয়ে কলকাতায় লুকিয়ে থাকে। পরে মার অসুস্থতার জন্য মাকে যেদিন দেখতে যায় সেদিন চাংড়িপোতায় ওকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জামিন দেওয়া হয়। ১৯০৮ সালের জানুয়ারী মাসে, বাংলা ১৩১৫ সালের ৫ই মাঘ, নরেনের মা পরলোক গমন করেন। মা'র শ্রাদ্ধ করার জন্য নরেন সে সময় চাংড়িপোতায় থাকে।

মৃত্যুর ৩।৪ দিন আগে নরেনের বিধবা মা জ্বরের ঘোরে মাংসের ঝোল খেতে চান। ডাঃ অশ্বিনী রায় তখন নরেনের মা'র চিকিৎসা করছিলেন। নরেন অশ্বিনীকে বলে মা'র যখন ইচ্ছা তখন মা'কে মাংসের ঝোল খেতে দেওয়া হোক। কিন্তু নরেনের অগ্রজ সুশীল এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবাকে মাংস খেতে দেওয়ায় আপত্তি করায় তাঁকে মাংস খেতে দেওয়া হয় না। অশ্বিনী রায় পরে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় বলেন : মা'র শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ থাকার জন্য নরেন সেদিন খুব দুঃখ পেয়েছিল।

এই সময় নরেন ও হরিকুমার পূর্ববঙ্গেও বহু ডাকাতি করে। নরেন জল ডাকাতিতে এই সময় দক্ষতা লাভ করে। একটা ডাকাতির কথা কালিচরণ ঘোষ মহাশয় লেখককে বলেন। এটি উনি হরিকুমার চক্রবর্তীর কাছ থেকে শুনেছিলেন। "একদিন একটি বাড়ীতে ডাকাতি করে পালাবার সময় নরেন একটি ছোট্ট মেয়ের গলা থেকে একটি সোনার হার ছিনিয়ে নিচ্ছিল। হরিকুমার এই

সুশ্রূষা করেন, রান্না করে খাওয়ান, ঘর পরিষ্কার করেন, বাসন মাজেন। নরেনদা নিজে হাতে করে সেইসব কলেরা রোগীর বিষ্ঠা পর্যন্ত পরিস্কার করে চালা বাড়ীটির থেকে একটু দূরে একটা গর্তের মধ্যে জমা করতেন। হরিদা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিতেন। আমরা তখন খুবই ছোট। আমরা দূরে অপেক্ষা করতুম, কোন কাজ বললে করতাম। আট জনের মধ্যে পাঁচ জন সেরে ওঠে। শ্রীঘোষ চাংড়ীপোতার লোক। তিনি আরও বললেন : এরকম সমাজসেবার দৃষ্টান্ত এবং নরেনদার ব্যক্তিগত সাহসিকতার অনেক অনেক ঘটনা আছে। কোন রকম সমাজসেবার কাজের ডাক এলেই নরেনদাকে পাওয়া যেত। শ্রীঘোষ বলেন : হরিদাকে একবার অনেকদিন পরে জিজ্ঞাসা করেছিলুম ; কেন আপনারা এই সমাজসেবার কাজ করতেন? হরিদা বলেছিলেন : আমরা যদি মানুষের উপকারে না আসি তাহলে কেন তারা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে ?

সময় নরেনের গলা টিপে ধরে ; নরেন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এরকম কাজ আর করবে না প্রতিজ্ঞা করার পরই হরিকুমার নরেনকে ছেড়ে দেয়।"[৮]

'যুগান্তর' পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশ করার পর বারীনের মনে হলো শুধু এর দ্বারা কিছু হবে না। তখন বারীন 'যুগান্তর' পত্রিকার দায়িত্ব অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, ১৯০৭ সালে, মানিকতলায় মুরারীপুকুরে বোমা তৈরীর একটি কারখানা করলেন। বারীন তখন ঠিক করলেন যে কিছু সন্ত্রাসমূলক কাজ করার দরকার দেশে বৈপ্লবিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করার জন্য।

এর পরেই মজঃফরপুরে 'কুখ্যাত' কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরামকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু যে গাড়ীতে কিংসফোর্ড ছিলেন বোমাটি সেই গাড়ীতে না পড়ে অন্য গাড়ীতে ভুল করে ফেলা হয়। এই অন্য গাড়ীতে মিসেন কেনেডী এবং তাঁর কন্যা ক্লাব থেকে ফিরছিলেন। এই বোমা ছোঁড়ার পেছনে অরবিন্দের হাত এবং উৎসাহ ছিল।[৯] এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পুলিস অনুসন্ধান চালিয়ে মানিকতলার বোমা তৈরীর কেন্দ্রটি উদ্ঘাটন করে এবং সেখান থেকে বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। আলিপুর বোমার মামলাতেই অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, এবং শৈলেন বসুকে ৪৮ নং গ্রে স্ট্রীটের একটি বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। হেমচন্দ্র কানুনগোকে আর একটি বাড়ী থেকে এবং সত্যেন বসুকে মেদিনীপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোট ৫৭ জনকে এই মামলায় আসামী করা হয়, তাদের মধ্যে নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হয়।

পুলিস যখন ঐ দলকে গ্রেপ্তার করতে মুরারীপুকুরে আসে, তখনই বারীন স্বগতোক্তি করে ঃ "আমার কাজ শেষ হয়েছে"। এতে দলের অনেকেই হতাশ হয়ে যায়। এবং এর পরেই বারীনের দলটি আস্তে আস্তে ভেঙ্গে যায়। জেলে থাকার সময়ই অরবিন্দ আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিমগ্ন হয়ে পড়েন এবং যোগ সাধনা শুরু করেন। মামলার শুনানীর সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের আবেগময়ী বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে দায়রা জজ অরবিন্দকে মুক্তি দেয়।[১০] বস্তুতঃ

(৮) কালীচরণ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎকার।

(৯) বিমান বিহারী মজুমদার, Militant Nationalism in India, পৃঃ ১১১।

(১০) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-এর উপর এম, এন, রায়ের রচনা (ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া, ৩০শে জুলাই ১৯৩১)।

অরবিন্দের পরিবর্তন এবং দেশবন্ধুর আবেদনে শুধু বিচারকই নন, কোর্টে উপস্থিত সকলেই সেদিন অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

এই বিচার চলার সময় কতকগুলি হত্যা ঘটে। প্রধান রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে জেলের মধ্যে কানাই দত্ত গুলী করে মারেন। ঐতিহাসিক বিমান বিহারী মজুমদার লিখেছেন ঃ "নরেন গোঁসাইকে গুলি না করলে অরবিন্দকে দীর্ঘকালের কারাদন্ড থেকে বাঁচানো শক্ত হতো"[১১] আলিপুর বোমার মামলা প্রায় দু'বছর চলে। এই মামলার সরকার পক্ষের উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে যতীন মুখার্জীর সহযোগী চারু বোস ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী গুলি করে মারেন ; এবং যতীন মুখার্জীর আর একজন সহযোগী ঢাকার বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট, শামসুল হক, যিনি এই মামলার তদারকি করছিলেন, তাঁকে দিন দুপুরে হাই-কোর্টে গুলি করে মারেন। ১৯০৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে ট্রেনের উপর চারবার বোমা নিক্ষেপ করা হয় কিন্তু এগুলি বিশেষ ক্ষতি-কারক হয় না। একটি ঘটনায় একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক একটু আহত হন। ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের সাব ইন্সপেক্টার নন্দলাল ব্যানার্জীকে গুলি করে হত্যা করা হয় কারণ তিনিই ক্ষুদিরামের সহযোগী প্রফুল্ল চাকীকে ধরিয়ে দেন। নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা করার পর চাংড়িপোতায় নরেনের বাড়ীর চতুর্দিকে পুলিস মোতায়েন করে রাখা হয়। এই সম্পর্কে নরেনের সম্পর্কীয় ভাইপো অলক চক্রবর্তীকে ১৬ই জুন ১৯৬৩ সালে ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত একটি চিঠিতে লেখেন ঃ "নরেন ভট্টাচার্য, ভূষণ মিত্র এবং আত্মোন্নতি সমিতির নরেন বসু আই, বি, এজেন্ট নন্দলাল ব্যানার্জীকে গুলি করে মারে। ক্ষুদিরামকে গ্রেপ্তার করার জন্যই নন্দলাল ব্যানার্জীকে পাঠানো হয়েছিল। এই গুলি করার ব্যাপারটার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ন্যাতড়ার (২৪ পরগণা) হেম সেন। হেম সেন যতীন মুখার্জীর একজন প্রিয় সহকর্মী ছিলেন।[১২]

(১১) বিমান বিহারী মজুমদার–Militant Nationalism in India ; p. 112

(১২) অলক চক্রবর্তীর সহিত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। পরে শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত ঐ সম্পর্কে আমার তথ্য যে সঠিক তা' বলেন। ১৯৪৯ সালের ১৭ই এপ্রিল "ইন্ডিপেডেন্ট ইন্ডিয়া" পত্রিকায় মানবেন্দ্রনাথ রায় লেখেন ঃ ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল (চাকী) তাদের তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে আমি দেখা করেছিলুম। ওটি তীর্থযাত্রাই ছিল, কারণ ওঁরা একজন অত্যাচারীকে হত্যা করবার জন্য যান নি, ওঁরা গিয়েছিলেন

আলিপুর বোমার মামলায় দেশবন্ধুর অপূর্ব ওকালতীর ফলে অরবিন্দ মুক্তি পান কিন্তু বারীন, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও হেমচন্দ্র কানুনগোর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সত্যেন বসু ও কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হয়। মোট ৩৯ জন আসামীর সাজা হয় এবং সতের জন খালাস পায়।

মুক্তি পাবার পর অরবিন্দ খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন এবং তারপর থেকে তিনি হিংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেন। ১৯০৯ সালের ১৭ই জুলাই কলেজ স্কোয়ারের একটি সভায় তিনি বলেন: "যদি সরকারের পক্ষ থেকে নিপীড়ন আসে তার বিরুদ্ধে বদলা না নিয়ে তাকে সহ্য করা প্রয়োজন।" এই সময়েই ভগিণী নিবেদিতা অরবিন্দকে সাবধান করে দেন যে সরকার ওঁকে বার্মায় অন্তরীণ করে রাখার কথা চিন্তা করছে। এবং যেদিন শামসুল আলমকে হত্যা করা হয় সেই দিনই অরবিন্দ কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে চন্দননগরের পথে রওনা হন। চন্দননগরে দু মাস থাকার পর অরবিন্দ পণ্ডিচেরী চলে যান।[১৩] তারপর অরবিন্দ আর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন নি এবং সাধনা ও ধর্ম কর্ম নিয়েই ১৯৫০ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ব্যপৃত থাকেন।

অরবিন্দের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং বারীন ও তাঁর দলের অন্যদের কারাদণ্ড সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে শুধু হতাশাই এনে দেয় না, বিপ্লবীদের নতুন নেতৃত্ব ও সংগঠনের প্রয়োজনকে প্রকট করে তোলে। সেই সঙ্গে সরকার অনুশীলন সমিতি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা ও সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করে দেয়। ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিন দাসকে দেশের বাইরে অন্তরীণ করা হয়। ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বাখরগঞ্জের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি এবং সাধনা সমিতি গুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। ঢাকা জেলাতেই সোনারং ন্যাশন্যাল স্কুলে তখন যতীন মুখার্জী, মাখনলাল সেন এবং নরেন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের একটি বড় ঘাঁটি হয়ে ওঠে। অনুশীলন সমিতি এবং

নিজেদের মায়ের (দেশমাতৃকা) কাছে উৎসর্গ করতে...... জাতীয়তাবাদ, স্বদেশের মুক্তির আদর্শ, ছিল তাঁদের কাছে তপস্যা, তাঁদের আত্মোৎসর্গের সাধনা। ক্ষুদিরাম নিজে ছিলেন সততা ও সত্যের প্রতীক"।

১৩) নির্বাণ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার।

অন্যান্য সমিতিকে সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষণা নরেনের সহ্য হয় না। নরেন তখন যতীন মুখার্জীর সঙ্গে কাজ করতে শুরু করে সরকারকে এর উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য।[১৪] এই সময় থেকে যতীন মুখার্জীর সঙ্গে নরেনের বৈপ্লবিক কাজকর্মে যোগাযোগ খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

অপরদিকে, ১৯০৮ সালে আরও দুটি ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা করা হয় বিপ্লবীদের কাজের যোগাযোগ করার জন্য। একটি হলো "শ্রমজীবি সমবায়"। এটি উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় খোলেন হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) প্রেসিডেন্সী কলেজের সন্নিকটে। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন এবং বারীন ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে বারীনের যুগান্তর দলের সঙ্গে রাজনীতি শুরু করেন। ১৯০৮ সালে অমরেন্দ্রনাথ যতীন মুখার্জীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক কাজ কর্ম করতে থাকেন।

আর একটি ঘাঁটি খোলা হয় কলকাতার ব্যবসায়ী এলাকা বড়বাজারে রাজা উডমন্ড স্ট্রীটে। এই ঘাঁটিটি পরিচালনা করেন হরিকুমার চক্রবর্তী। এই দুটি ঘাঁটিই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রকাশ্যে চলতে থাকে এবং এই দুটি ঘাঁটির মাধ্যমে যোগাযোগ ও পরিচালনা করেন যতীন মুখার্জী ও নরেন ভট্টাচার্য। যতীন মুখার্জীর সাহসিকতা এবং স্নেহপ্রবণতা ওঁকে বিপ্লবীদের কাছে খুব প্রিয় করে তোলে। এই সময় থেকে যাঁরা যতীন মুখার্জীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে বিপ্লবের নেতৃত্বে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য, অতুল কৃষ্ণ ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন। এবং তখন থেকে বিপ্লব পরিচালনা মোটামুটিভাবে এই সমষ্ঠিগত নেতৃত্বের হাতে আসে।

এই লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ডাঃ অশ্বিনী রায় বলেন ঃ "অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষণা করবার পর আমার মতো অনেকেই বিপ্লবী রাজনীতি থেকে সরে যাই। আমরা অনেকেই রাজনীতি করতাম আমাদের নিজের কাজ কর্ম বজায় রেখে ; রাজনীতি আমাদের পেশা ছিল না। দেশকে ভালবাসতুম সেজন্যই যতটুকু পারতুম রাজনীতিতে সময় দিতুম। কিন্তু নরেন ছিল অন্য প্রকৃতির। নরেনের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা, তাই নরেন রাজনীতি ছাড়া আর কিছু ভাবতো না। এই সময় থেকে নরেন নেতা হিসাবে উঠতে লাগলো। এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে নরেন তখন বিভিন্ন দল ও

(১৪) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ; পৃঃ ৩৪১

নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিপ্লবীদের একটা যোগসূত্র গোড়ে তোলে ঃ বলতে গেলে নরেনই আবার নতুন করে বিপ্লবের দল গোড়ে তোলে। অরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন, বারীনের দল ভেঙ্গে গিয়েছে, অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষিত হয়েছে—যা রয়ে গিয়েছিল নরেন তাই নিয়ে নতুন করে শুরু করে।"

এই সময় নরেন কয়েকটি ডাকাতি করে টাকা তোলার জন্যে। এর মধ্যে একটি ডাকাতি করে ন্যাতড়ায় (২৪ পরগণা), ডায়মন্ড হারবারের কাছে, ১৯০৯ সালের ২৫শে এপ্রিল। ডাকাতি করে বাড়ী থেকে বেরোবার সময় মুখোসধারী নরেন বাড়ীর মালিককে বলে আমরা ইংরাজদের তাড়াবার জন্য টাকাটা ধার নিচ্ছি মাত্র।[১৫] এই ডাকাতি থেকে ২০০০ টাকা পাওয়া যায়।

এই ডাকাতীর জন্য নরেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কিন্তু ১লা জুন নরেন জামীনে মুক্তি পায়। তারপর নরেন লুকিয়ে পড়ে এবং বেশীর ভাগ সময়ই হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে থাকে। যে দুজন মোক্তার এই মোকদ্দমায় নরেনের জামীনদার হয়েছিল, বিপ্লবীরা তাদের জামীনের মূল্য দিয়ে দেয়।

হাওড়া থেকে নরেন বিভিন্ন দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা চালায়। ইংরাজদের সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা তাড়াতে হবে এটা নরেনের প্রায় বদ্ধমূল ধারণা হয়েগিয়েছিল এবং সেই ব্যাপারে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকে। এই লেখকের কাছে নির্বাণ স্বামী বলেন তখন নরেনের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হতো। পরে যখন যতীন মুখার্জী ও নরেন ভট্টাচার্য সহ ৪৪ জন হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়, তখন নির্বাণ স্বামী বিপ্লবীদের পক্ষে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় সেই মামলার তদ্বির করেন। নির্বাণ স্বামী লেখককে বলেন ঃ নরেনের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা অন্যান্য বিপ্লবীদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল এবং নরেন বৈপ্লবিক রাজনীতিতে তখন একজন দুর্ধর্ষ নেতা হয়ে উঠেছিল। নির্বাণ স্বামীর মতে "নরেনের রাজনৈতিক মতবাদ তখনই সমাজতন্ত্র ঘেঁষা ছিল এবং নরেন ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে তফাৎ রাখতো।"[১৬]

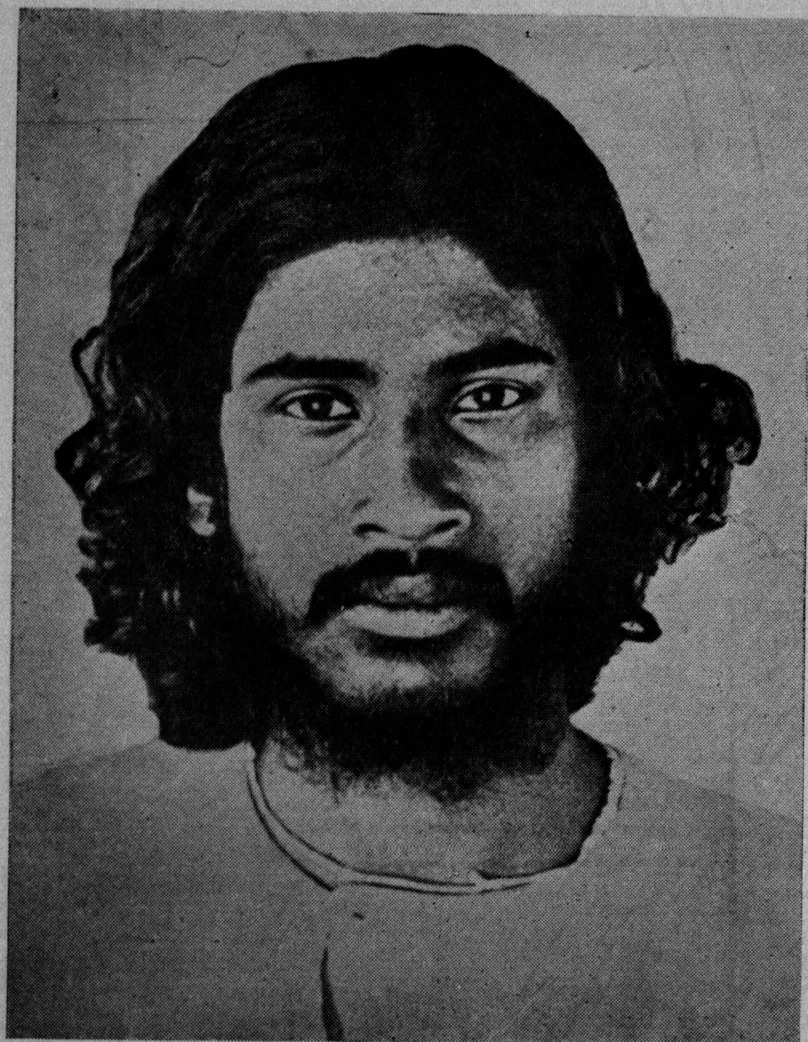
---

(১৫) অলক চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(১৬) নির্বান স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার। লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও একই কথা বলেন। পরে এম, এন, রায় তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লেখেন ঃ "আমরা সকলেই শোষিত ও দরিদ্র মানুষের উন্নতি করার জন্য একটা ইচ্ছা পোষণ করতুম। বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ আমাদের সকলকেই এ ব্যাপারে অনুপ্রেরণা দিয়েছে"। (পৃঃ ১৮)

সেই সময় নরেন বিদেশী সরকারকে উচ্ছেদ করে কি ধরনের সরকার দেশে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সে বিষয়েও চিন্তা ও আলোচনা করতো। এবং নরেনের মতে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনী নেতার সরকার প্রতিষ্ঠা নয়, দেশের প্রয়োজন প্রকৃত জনগণের সরকার এবং এ মত সে জোর গলায় প্রকাশ করতো। নরেন বলতো যে "এই ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা আনতে পারলেই সম্ভব হবে।" লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় বিপ্লবী নেতা ভূপতি মজুমদার ঐ কথাগুলি লেখককে বলেন এবং আরও বলেন যে সে সময় নরেনই আমাদের নেতা এবং রাজনৈতিক আলোচনায় নরেনের ধ্যান-ধারণা আমাদের অনেকের চেয়েই অনেক বেশী এগিয়ে ছিল। ভূপতি মজুমদার আরও বলেন যে গ্রামীন অর্থনীতির ব্যাপারে নরেন জোতদার-বিরোধী ছিল এবং নরেন বলতো যে জোতদারদের অপসারণ না করতে পারলে চাষ এবং গরীব চাষীর কোনদিন উন্নতি সাধন হবে না।[১৭]

(১৭) ভূপতি মজুমদারের সহিত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।



নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ঃ ১৯১০ সাল
(হাওড়া ষড়যন্দ্র মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার সময়)

পাঁচ ঃ হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা

২৪শে জানুয়ারী ১৯১০ সালে শামসুল হককে হত্যা করার পর বীরেন দত্তগুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বীরেন দত্তগুপ্তর মামলা চলার সময় বীরেন কিছু বলতে অস্বীকার করে। তখন প্রেসিডেন্সী ম্যাসিস্ট্রেট বীরেনকে দায়রায় সোপর্দ করে মামলাটি হাইকোর্টে পাঠায়। এই সময় একজন গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ অফিসার জেলে ওঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ অফিসারটি 'যুগান্তর' পত্রিকার একটি জাল কপি ছাপিয়ে বীরেনকে দেখায়। ঐ জাল কপিটিতে বীরেনের নামে কটাক্ষ থাকে এবং বীরেনের বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা থাকে। ঐ জাল 'যুগান্তর'-এর কপিটি পড়ে, বীরেন বলে ঃ যে যা পারে আমার বিরুদ্ধে লিখুক, একজন আমাকে জানে এবং তাঁর সমর্থনের জন্য আমি গর্বিত। কে সেই একজন? পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞাসা করায় বীরেন যতীন মুখার্জীর নাম করে।[১]

এই নাম শোনার পরই যতীন মুখার্জী সহ ৪৪ জন আসামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার শুরু করে। এই মামলাটিরও নথিপত্র তৈরী করার ভার ছিল শামসুল হকের উপর যাকে বীরেন দত্তগুপ্ত হত্যা করে।

বীরেন দত্তগুপ্তর বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পর তাকে হাওড়া জেলে আনা হয় এবং সেখানে বীরেন যতীন মুখার্জীকে সনাক্ত করে। যতীন মুখার্জীর উকিল বুদ্ধি করে সেদিন বীরেনকে জেরা করতে অস্বীকার করেন। পরের দিন বীরেনের ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু বীরেনকে জেরা করা হয় নি সেই আইনগত ত্রুটি যতীন মুখার্জীর পক্ষে যায় এবং ঐ অজুহাতে ঐ ব্যাপারে যতীন মুখার্জী প্রাণদন্ড থেকে রক্ষা পান।

ইতিমধ্যে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু মামলার নথিপত্র এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ঠিক না থাকাতে সমস্ত আসামীই

(১) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি ; পৃঃ ৩৩৯

১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে খালাস পেয়ে যায়। নথিপত্র এবং সাক্ষী সাবুদ ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল শামসুল হকের উপর। এবং শামসুল হককে হত্যা করার পর সেই কাজটি অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার ফলেই মামলাটিতে সরকার পক্ষের পরাজয় হয়। এই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার আসামীদের বিভিন্ন দলভুক্ত বলে আখ্যা দেয়।[২] তার মধ্যেই সরকার একটি দলের নাম দিয়েছিল 'যুগান্তর' দল এবং এই দলটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে হিংসাত্মক পন্ধতিতে উচ্ছেদ করতে চায়।

১৯১০ সালের ২৯শে জানুয়ারী যতীন মুখাজী এবং নরেন . ভট্টাচার্য সহ বেশীর ভাগ আসামীকেই গ্রেপ্তার করা হয়। নরেনকে গ্রেপ্তার করা হয় শিবপুরে বজরঙ-এর বাড়ী থেকে।[৩] এই ৪৪ জন ধৃত আসামীরা হলেন— যতীন্দ্রনাথ মুখাজী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দ-বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা), পবিত্র দত্ত, ননীগোপাল সেনগুপ্ত, ভূদন মুখোপাধ্যায়, ভূতন মুখোপাধ্যায়, বিষ্টুপদ চট্টোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র মিত্র, অতুল মুখোপাধ্যায়, গণেশ দাস, নরেন্দ্রনাথ বসু, হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকুমার দাস, রজনী ভট্টাচার্য, ইন্দুকিরণ ভট্টাচার্য (ওরফে চক্রবর্তী), তিনকড়ি দাস, চুনিলাল নন্দী, বিধুভূষণ বিশ্বাস, সুশীলকুমার বিশ্বাস, মন্মথ নাথ বিশ্বাস, বিজয় চক্রবর্তী, শ্রীশচন্দ্র সরকার, ভূষণচন্দ্র মিত্র, বিমলাচরণ দেব, ডাঃ শরৎচন্দ্র মিত্র, সুরেশচন্দ্র মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দে, কালিপদ চক্রবর্তী, শৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দাশরথী চট্টোপাধ্যায়, শিবু হাজরা, অতুল পাল, মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, কিরণচন্দ্র রায়, নিবারণচন্দ্র মজুমদার, চারুচন্দ্র ঘোষ, পুলিনবিহারী সরকার (ওরফে মিত্র), রমাপদ মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, তারানাথ রায়চৌধুরী, কার্তিকচন্দ্র দত্ত, আনন্দ রায়, ও নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৯শে জানুয়ারী ১৯১০ সালে এঁরা গ্রেপ্তার হন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় ৪ঠা মার্চ এবং ২৯শে জুলাই ১৯১০ সালে আসামীদের

(২) অন্যান্য দলগুলির নাম যা মামলার বিবরণ থেকে পাওয়া যায় তা হলো: কৃষ্ণনগর গ্রুপ, হলুদবাড়ী গ্রুপ, রাজশাহী গ্রুপ, শিবপুর গ্রুপ, খিদিরপুর গ্রুপ, মজিলপুর গ্রুপ এবং ছাত্র ভান্ডার গ্রুপ। (ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি; পৃঃ ৪৪-৪৫)

(৩) নির্বান স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার। নির্বান স্বামী বজরঙের পুরো নামটি বলতে পারেন নি।

দায়রায় সোপার্দ করে হাইকোর্টের এক স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারার্থে পাঠানো হয়।

যে অপরাধে ওঁদের অভিযুক্ত করা হয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে বলা হয়: "১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত, এই দুই সাল সহ, হাওড়া জেলার শিবপুরে এবং ব্রিটিশ-শাষিত ভারতের অন্যান্য স্থানে এইসব আসামীরা নিজেরা এবং নিম্নলিখিত ললিত চক্রবর্তী যতীন্দ্রনাথ হাজরা, সতীশচন্দ্র সরকার,[৪] বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র দাস, উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার ঘোষ এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত মিলিতভাবে ব্রিটিশ সম্রাটের বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষ থেকে তাঁর রাজত্বের বিলোপসাধন করার উদ্দেশ্যে এবং ভারতবর্ষে আইন সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করায় তাহাদের ভারতীয় পেনাল কোর্ডের ১২১ক ধারায় অভিযুক্ত করা হইল।"

এই মামলায় যতীন্দ্রনাথ হাজরা এবং ললিতকুমার চক্রবর্তী রাজসাক্ষী হন।

এই মামলার বিবরণী থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক ডাকাতি ঘটেছিল এবং এই মামলাতেই প্রথম দেখা যায় যে এই বিপ্লবী দলগুলি দশম জাট রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে উক্ত রেজিমেন্টের সিপাহীদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দেবার জন্য উৎসাহিত করে।[৫] এরই ফলে উক্ত রেজিমেণ্টটিকে সরকার বাতিল করে দেয়।

আর্জিতে সরকার এই "চক্রান্ত"কে অনেকগুলি রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত করে বলে যে, দু'জন পুলিশ অফিসার এবং একজন গুপ্তচর (informer) কে এরা খুন করেছে, এরা অস্ত্র-শস্ত্র মজুত করেছে এবং ১০ম জাট রেজিমেন্টের অনেক সৈন্যের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য নষ্ট করে দিয়েছে এবং তদুপরি এইসব ভদ্রলোকেরা বহু সংখ্যক ডাকাতি করে এই ষড়যন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্যে অনেক অর্থ জোগাড় করেছে। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে 'ছাত্র ভান্ডার' এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার যোগাযোগ আছে বলেও সরকারের আর্জিতে বলা হয়।[৬]

মানিকতলায় বোমা তৈরীর কেন্দ্রটি স্থাপন করার পর, 'যুগান্তর'

(৪) সতীশচন্দ্র সরকার নির্বান স্বামীর পূর্বেকার নাম। উনি এই মামলায় এবং আলিপুর বোমার মামলা দুটিতেই অভিযুক্ত হন কিন্তু পুলিশ ধরতে পারেন না।

(৫) Calcutta Weekly Notes, Vol. XV ; p. 597

(৬) ঐ

পত্রিকার ভার যতীন মুখার্জীর উপর এসে পড়ে। সেই সময় কিরণ মুখোপাধ্যায় বহুদিন এই পত্রিকাটি চালায়। যতীন মুখাজীই কিরণ মুখোপাধ্যায়কে এই দায়িত্ব দেন। এই সময়েই নরেনও 'যুগান্তর' পত্রিকার কাজ দেখাশুনা করে এবং মাঝে মাঝে পত্রিকার জন্য লিখতেও থাকে।

মামলা চলার সময় জেলের মধ্যেই নরেনের উৎসাহে এবং কর্মতৎপরতায় যতীন মুখার্জী এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা একটি শক্তিশালী বিপ্লবী গোষ্ঠী গোড়ে তোলে। এবং সেই দলটিই জেলের মধ্যে থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে কি ভাবে সশস্ত্র অভিযান করা হবে সে সম্বন্ধেও আলোচনা করে। তখন তাঁদের মোটামুটি ঠিক হয়েছিল যে ১৯২০ নাগাৎ এই সশস্ত্র অভিযান করা যাবে কারণ তাঁদের ধারণা ছিল ঐ সময় নাগাৎ একটা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা এবং তখন জার্মানী এবং তুরস্ক ইংরাজদের বিরুদ্ধে ওঁদের সাহায্যে আসবে।[৭] জাট রেজিমেন্টের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করার পর এবং ঐ রেজিমেন্টের সংগে একটা ভাল সম্পর্ক গোড়ে ওঠার পর তাদের মারফৎই ওঁরা ব্রিটেন ও জার্মানীর মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা জানতে পারেন। এছাড়া ওঁদের অন্যান্য বিপ্লবী বন্ধু-বান্ধব মারফৎও বাইরে থেকে এই ধরনের সংবাদ আসে। সে কারণ যতীন মুখাজী এবং নরেন জেলের মধ্যে থেকেই ওঁদের মোটামুটি একটা ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঠিক করেন।

মানিকতলায় বারীন ঘোষের নেতৃত্বে যে বিপ্লবী গোষ্টি গোড়ে উঠেছিল তাঁরা বোমা তৈরী করা এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভীতি-প্রদর্শনের জন্য কিছু কিছু সন্ত্রাসমূলক কাজ মারফৎ একটা বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। এই পরিকল্পনাটি ছিল পুরোপুরি বারীন ঘোষের। কিন্তু এর ফলেই বারীনের সংগে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বিরোধ হয়। যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ও হিংসাত্মক পথে বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু সেই হিংসাত্মক, সশস্ত্র অভিযান ইংরাজ সরকারকে ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য করতে চেয়েছিলেন। শুধু কয়েকটি হত্যা দ্বারা ভয় দেখাতে নয়। যতীন বন্দোপাধ্যায় যা চেয়েছিলেন তার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক প্রস্তুতির। কিন্তু বারীনের লক্ষ্য ছিল শুধু বোমা তৈরী করে, কিছু হত্যা ঘটিয়ে ইংরাজকে ভয় দেখানো এবং দেশের মানুষের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ করা। তাই পুলিস যখন মুরারীপুকুর গার্ডেনসে বারীন এবং তাঁর দলকে ধরতে আসে, বারীন বলে ঃ "আমার কাজ শেষ"।

---

(৭) অলক চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।

বস্তুত মানিকতলায় বারীনের নেতৃত্বে যে আড্ডাটি গড়ে উঠেছিল সেটি কিংসফোর্ডকে হত্যা করার অপপ্রয়াসেই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এই কিংসফোর্ড সাহেব কলকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বহু ছাত্রকে রাষ্ট্র-বিরোধী কাজ করার জন্য গুরুদন্ড দিয়েছিলেন। যে জন্য বিপ্লবীদের একটি বিচারক-মন্ডলী—এর মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, চারু দত্ত এবং সুবোধ মল্লিক—কিংস ফোর্ডকে গোপন বিচারে পূর্বেই ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। ও'রাই ক্ষুদিরামকে সেই হুকুম তামিল করার জন্য নিয়োগ করেছিলেন। ক্ষুদিরামের তখন বয়স ১৯ এবং ওঁকে বিপ্লবী দলে নিয়ে আসেন মেদিনীপুরের সত্যেন বসু। ক্ষুদিরামের সহযোগী হিসাবে নিয়োগ করা হয় প্রফুল্ল চাকীকে।[৮]

সন্ত্রাসবাদের আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা প্রথম বারীনই দেন। কারণ বারীন মনে করতেন যে যত কাপুরুষই কোন লোক হোক না কেন তাকে যদি ঠিক মত অনুপ্রাণিত করা যায় তাহলে তাকে দিয়ে দেশের জন্য একটা খুন করানো যেতে পারে এবং দেশের জন্য সে সর্বকিছু ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হ'বেনা। এম. এন. রায় পরবর্তীকালে "ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া"তে যতীন মুখার্জী"র ওপর যে প্রবন্ধ লেখেন তাতেই লিখেছিলেন "বারীন বলতো যে অত্যন্ত ভীতু একটা লোককেও যদি বোঝানো যায় যে সমস্ত দেশ তোমাকে বাহাদুরী দিচ্ছে তাহলে সে অকুণ্ঠ চিত্তে ফাঁসীর মঞ্চে হেঁটে যেতে পারতো।"[৯]

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় যারা অভিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁদের সংগে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সবথেকে বড় তফাৎ ছিল এইখানে যে হাওড়ায় অভিযুক্ত বিপ্লবীরা শুধুমাত্র সন্ত্রাসমূলক ঘটনাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং লক্ষ্য আরও গভীর এবং দূরদর্শী ছিল। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে এটা পরিস্কার বোঝা যায় যে ঐ দলগুলি সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রস্তুত করছিল এবং তারজন্য সবথেকে প্রথম প্রয়োজনীয় কাজ বাংলার চারিদিকে সুদৃঢ় সংগঠন গোড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা—সেগুলি তাঁরা করছিলেন। দ্বিতীয়, এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থ তাঁরা ডাকাতি করে পরিকল্পনা অনুসারে তুলছিলেন ; তৃতীয়, ব্রিটিশ সৈন্যের

(৮) বিমান বিহারী মজুমদার–Militant Nationalism in India ; পৃঃ ১১০-১১

(৯) M. N. Roy—Jatin Mukherjee [Independent India ; 27th February 1949].

মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে তারা সরকারের সব থেকে শক্ত এবং প্রধান ঘাঁটি-টিকেই বিনস্ট করার প্রস্তুতি করছিলেন এবং চতুর্থ, সশস্ত্র অভিযানের জন্য গোলা, বারুদ ও বন্দুক সংগ্রহ করছিলেন এবং দলের মধ্যে এসবের শিক্ষার ব্যবস্থা করছিলেন।

সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তা আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায় হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার সংগে সংগেই শেষ হয়। মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরে অরবিন্দ এবং বারীনের দলটি ভেংগে যায় এবং ছত্রভংগ হয়ে পড়ে। এই মামলায় যতীন বন্দোপাধ্যায়ও অভিযুক্ত হ'ন ; কিন্তু প্রমানাভাবে তিনি ছাড়া পান। ছাড়া পাবার পর যতীন্দ্রনাথ (বন্দোপাধ্যায়) বৃন্দাবন চলে যান। এবং অরবিন্দও ছাড়া পাবার কিছুকাল পরে পন্ডিচেরীতে চলে যান এবং সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহন করেন। বারীন এবং অন্যান্যরা দীর্ঘকাল কারাবন্দী থাকেন। ১৯০৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর কলকাতায় অনুশীলন সমিতি এবং আত্মোন্নতি সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়ার ফলে এই দুটি সংগঠনও ভেংগে পড়ে। পরে অনুশীলন সমিতির ঢাকা কেন্দ্রের প্রধান সংগঠক পুলিন দাসকে গ্রেপ্তার করার ফলে সমিতির সভাপতি প্রমথ মিত্র শোকে অভিভূত হয়ে মারা যান। অনুশীলন সমিতি এর পর থেকে ঢাকার অনুশীলন সমিতি নামে একটি ছোট সংগঠন হিসাবে টিঁকে থাকে। কিন্তু ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকার অনুশীলন সমিতি সহ বাখরগঞ্জের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি এবং ময়মনসিংহের সহৃদ ও সাধনা সমিতিকে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়।

এই অবস্থায় যতীন মুখোপাধ্যায় এবং নরেনের উপর এইসব ভাংগা দলগুলিকে একসংগে মিলিয়ে একটি সংগঠন গোড়ে তোলার দায়িত্ব পড়ে এবং ও'দের যুক্ত প্রচেষ্টা দ্বারাই পরবর্তীকালে যুগান্তর দলের পুনর্গঠন সম্ভব হয়। সংগঠনের পরিকল্পনা এবং সবাইকে একত্রীভূত করার কাজ নরেন করে— যতীন মুখার্জীর সহযোগীতায়। এই কাজের মাধ্যমে ক্রমশ দুজনের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়। বস্তুত নরেনের সাংগঠনিক শক্তি এবং যুগান্তর পার্টির (যা ইংরাজ সরকার 'যুগান্তর' পার্টি বলে অভিহিত করে) সংগঠনে চাংড়িপোতা দলের বিরাট অবদানের জন্যেই যতীন মুখোপাধ্যায় নরেনকে তাঁর দলের দ্বিতীয় নেতা হিসাবে বেছে নেন।

ছয়ঃ নূতন উদ্যোগ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাংগঠনিক পদ্ধতিতে দুই বঙ্গের পুনঃ একত্রীকরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সুরেন্দ্রনাথ এবং ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার (ইনি পরে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন) দুই বঙ্গে ২৫টি জেলার মধ্যে ১৮টি জেলা থেকে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহি-সম্বলিত একটি স্মারকপত্র ১৯১১ সালের জুন মাসে সরকারের কাছে পেশ করেন। অপর দিকে নাশকতামূলক এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তদুপরি মাণিকতলা এবং হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র থেকে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ও সংগঠনের সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় বোধহয় বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ইংরাজরা নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করে। বস্তুত, ১৯১০ সালের শেষের দিকেই নতুন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং পররাষ্ট্র সচিব ক্রিউয়ে (Crewe) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাংলা-বিভাগই ভারতবর্ষের বিক্ষোভের প্রধান কারণ, এবং যতদিন এটি রদ করা না হবে ততদিন শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।(১) ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯১১ সালের ২৫শে আগস্ট বাংলা-বিভাগ রদ করার জন্য বিলাতে আবেদন করে। সেই বৎসর ১২ই ডিসেম্বর ইংরাজ সম্রাট বাংলা-বিভাগ রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে; কিন্তু সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানীকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তও জারী করে। তাছাড়া একদিকে বিহার ও উড়িষ্যাকে এবং অন্যদিকে আসামকে স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে গঠন করে কিছু বাংলাভাষাভাষী অঞ্চল বিহার ও উড়িষ্যার সঙ্গে জুড়ে দেয়।

দুই বাংলার একত্রীকরণকে বহু বাঙ্গালীই স্বাগত জানায় এবং বেশীর ভাগ বাঙ্গালীই এতে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যে সময় পেরিয়ে যায় তার মধ্যে বাংলাদেশে উগ্র জাতীয়তাবাদ সংগঠিত হতে থাকে;

(১) রমেশচন্দ্র মজুমদার—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস: দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ২৬৩।

এই একত্রীকরণের ফলে তা' সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায় না। বৈপ্লবিক কার্য-কলাপ চলতেই থাকে সমস্ত রকম সরকারী বিধি-নিষেধ এবং দণ্ডমূলক ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করে'। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী আন্দোলন ভারত সরকার খুব সহজেই দমন করতে পেরেছিল, যেটা বাংলাদেশে সম্ভব হয় নি। এর একটা প্রধান কারণ বোধহয় মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানত চিতপাবন ব্রাহ্মণদের দ্বারাই পরিচালিত ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের আন্দোলন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং এরা বয়সেও ছিল নবীন। ১৯১৮ সালের সিডিশন কমিটির (Sedition Committee) রিপোর্ট অনুযায়ী যে ১৮৬ জন বাঙ্গালীকে বিভিন্ন বৈপ্লবিক এবং নাশকতামূলক কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হয় তার মধ্যে ৬৮ (৩১%) জন ছিল ছাত্র এবং ৫০ জনের বয়স ২০-র নীচে। বেশীর ভাগ বিপ্লবীই ছিল ২১ থেকে ৩০ বয়ঃসীমার মধ্যে এবং এই বয়সের যুবক ছিল ১০৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৬ জন। অর্থাৎ ১৮৬ জনের মধ্যে ১৭৩ জনই ৩০ বৎসরের মধ্যে ছিল। জাতি হিসাবে, ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী ৮৭ জন (অর্থাৎ শতকরা ৪৬ জন) ছিল কায়স্থ; ৬৫ জন অর্থাৎ শতকরা ৩৫ জন ব্রাহ্মণ, এবং ১৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৭ জন বৈদ্য। কিন্তু মহারাষ্ট্রে প্রায় প্রত্যেকেই ছিল ব্রাহ্মণ, এবং বেশীর ভাগই চিতপাবন ব্রাহ্মণ—তিলকের সম-গোত্রীয়।

এর পর ১৯১২ সালে ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জকে হত্যা করার জন্য দু'জন বাঙ্গালী বোমা নিক্ষেপ করে। একজন হলেন রাসবিহারী বসু এবং অন্যজন বসন্তকুমার বিশ্বাস যিনি বোর্খা পরে' মুসলমান মহিলার ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন। এই বোমা নিক্ষেপ থেকেই দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার শুরু হয়। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ ছিল এবং যে বোমাটি ছোঁড়া হয় সেটি চন্দননগরে তৈরী হয়, এবং অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ই বসন্ত বিশ্বাস মারফৎ রাসবিহারী বসুকে তা পাঠান।(২) অমরেন্দ্রনাথ এবং মতিলাল রায় চন্দননগরে ১৯১০ সালে বিপ্লবীদের একটি গোপন ঘাঁটি স্থাপন করেন।(৩)

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে খালাস পেয়ে নরেন সুরেশচন্দ্র মজুমদারের (আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা) সঙ্গে সরলাবালা সরকারের বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। সুরেশ মজুমদারের সঙ্গে নরেনের হাওড়া মামলায় জেলে থাকা-

(২) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি; পৃঃ ৩০১।
(৩) —ঐ— পৃঃ ৩০২।

কালীন খুবেই বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।(৪) এই সময়েই নরেন সাধু খোঁজার ভান করে বিপ্লবের সংগঠনের প্রচেষ্টায় বহু জায়গায় ঘোরেন যেন গুরু খুঁজছেন, এই ভাব দেখান। বস্তুত অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, নরেন গুরু খুজে বেড়াচ্ছে—সাধু হয়ে গেছে। ভূপতি মজুমদার আমাকে বলেনঃ "এই সময় নরেন আমাকে বহু সাধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল।" ভূপতি মজুমদার বিশ্বাস করতেন, নরেন তখন সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজেই ব্যাপৃত ছিল। নরেনের আত্মীয় ফণী চক্রবর্তী যখন সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েন, ১৯১৫ সালে, তিনি পুলিশের কাছে যে স্বীকারোক্তি করেছেন তাতে তিনিও ঐ কথা বলেছেন। ঐ সময় পাঁচ-ছয় মাস নরেন কাশীতে ও পাটনায় থাকে। প্যাটনায় তখন নরেন ফণীন্দ্রনাথ মিত্রের(৫) ওখানে থাকেন এবং প্রেসের কাজ শেখেন। বহুদিন পর—১৯৩৭-৩৮ সাল নাগাৎ নরেন (তখন এম এন রায়) পাটনায় আসেন। ফণী মিত্র মহাশয় তখন রয়টারের পাটনার সংবাদ দাতা। তিনি এম· এন· রায়ের দু'একজন তৎকালীন সহযোগীকে বলেনঃ "চল তো হে, তোমাদের ঐ এম এন· রায়'কে দেখে আসি। আমার মনে হচ্ছে, ও আমাদের নরেন ভট্টাচার্য, ওকে আমি খুব ভাল করে জানি।" ফণীবাবু যখন এম· এন· রায়ের কাছে যান, তখন কিছুক্ষণ দেখার পর এম এন· রায় দাঁড়িয়ে উঠে ফণীবাবুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ফণীদা'। ফণীন্দ্রনাথ মিত্র এক সময় বারীন ঘোষের 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হন, এবং ছয় বৎসর জেল খাটেন। ১৯১২ সালে ছাড়া পেয়ে তিনি পাটনায় বসবাস করেন।

৪। আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম পরিচালক কানাইলাল সরকার আমাকে বলেনঃ তাঁর যখন ১॥—২ বৎসর বয়স তখন সরলাবালা সরকার (কানাই সরকারের পিসীমা) ওঁকে নিয়ে ঘাটশিলায় যান, টাইফয়েড থেকে সেরে উঠে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। সঙ্গে যান নরেন, কানাইলালের সেবাশুশ্রূষা করার জন্য। নরেন যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং ছয় বৎসর কারাবাসের পর ছাড়া পেয়ে প্রথম কলকাতায় আসেন, তখন সুরেশ মজুমদারের সঙ্গেই প্রথমে থাকেন এবং কানাইলালকে দেখতে চান।

৫। ৪ঠা এপ্রিল ১৯০৮ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় "ইংলিশম্যানের অত্যাচার" সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ১০ই এপ্রিল অভিযুক্ত হন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচারে তাঁর ১ বছর ১১ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা ধার্য হয়।—[শ্রীঅরবিন্দ এবং বাংলায় বিপ্লববাদ বা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় (ফার্মা কে· এল· মুখোপাধ্যায়; পৃঃ ৪৯)]।

তখন শিবনারায়ণ স্বামী মারা গেছেন। নরেনের কাশী যাওয়ার হয়তো একটি কারণ ছিল, হয়তো সিপাই বিদ্রোহের কোন পলাতক আসামী সাধু হয়ে কাশীতে থাকতে পারেন যাঁর কাছে গেরিলা যুদ্ধের সম্পর্কে কিছু শিক্ষা পাওয়া যেতে পারে। এই সময়েই নরেন কাশীতে একটি বিপ্লবী ঘাঁটিও সংগঠন করে। নরেন তখন ইংরাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছিল এবং তার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। সম্ভবতঃ নরেন সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করার যে দায়িত্ব নিয়েছিল, তার জনাই সমস্ত রকম সাবধানতা অবলম্বন করেছিল এবং সাধু সেজে বেড়ানো তারই একটি কৌশল।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নরেন তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুশীলের কাছে ২০০৲ শত টাকা চায়—হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার কোর্ট খরচের জন্য। ঐ টাকা সুশীল ও নরেন তাদের চাংড়িপোতার বাড়ী বন্ধক দিয়ে জোগাড় করে। যতীন চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোকের কাছে বাড়ীটি বন্ধক দেওয়া হয়। সুশীলের স্ত্রী তখন মারা গেছে, এবং অন্য কোন স্ত্রীলোক বাড়ীতে না থাকায় সুশীল, নরেন এবং অন্যান্যেরা তখন ৬নং মিরজাপুর স্ট্রীটে একটি মেসে গিয়ে ওঠেন। চাংড়ীপোতার বাড়ীটি আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

নরেন অবশ্য বেশীর ভাগ সময়ই এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতো এবং কখনো-কখনও সুশীলের কাছে এসে থাকতো। সুশীল নরেনের কার্যকলাপ এবং গতিবিধিও কিছু কিছু জানতেন; তিনি নরেনকে বাধা তো দিতেনই না, বরং আগলে রাখতেন। এই সময় নরেন একটি চাকরীও নেয় এবং সেটিও তার বিপ্লবী কাজকর্মকে লুকিয়ে রাখার জন্য। নরেন ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল এ্যাসুওরেন্স কোম্পানীর (India Equitable Assurance Company) এজেন্ট হয়।(৬) কিছুদিন নরেন বেলেঘাটার একটি ধানকল এবং কাঠের গোলার বিল কালেক্টর হিসাবেও কাজ করে।(৭) ১৯১২ সালের শেষ থেকে প্রায় এক বছর নরেন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের একটি মেসবাড়ীতে থাকে। সেখানে থাকার সময়ই নরেনের প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোস্টেলে যাতায়াত শুরু। সেখানে সতীশ চক্রবর্তীর ঘরে ছাত্রদের সঙ্গে সকালে চা-পান এবং রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হোত।(৮) সতীশ চক্রবর্তী তখন এম· এ· ক্লাশের ছাত্র। সন্ধ্যার সময় নরেন এবং যতীন মুখোপাধ্যায় প্রায়ই ১১০ নং কলেজ স্ট্রীটে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের মেসেও যেতেন। এই সান্ধ্য আড্ডায় যাঁরা যোগ দিতেন

(৬) নরেন ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ললিতকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(৭) —ঐ—।
(৮) সতীশ চক্রবর্তীর সহিত লেখকের সাক্ষাৎকার।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (পরবর্তীকালে ইউ· জি· সি·-র চেয়ারম্যান হন)(৯) এবং মেঘনাদ সাহা। পরে এম এন রায় ১৯২১ সালে মস্কো থেকে যখন নলিনীকান্ত দাসগুপ্তকে তাঁর দূত হিসাবে ভারতবর্ষে পাঠান তখন তাঁকে মেঘনাদ সাহার সংগে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল।(১০)

এই সব আড্ডার সম্পর্কে বলতে গিয়ে সতীশ চক্রবর্তী মহাশয় লেখককে বলেনঃ "যদিও নরেনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগ হয় নি নরেনের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা খুবই উচ্চমানের ছিল এবং সেজন্য নরেনকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করতো। এই সময়েই নরেন স্বাধীন ভারতে কি ধরণের সরকার গঠিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে, এমন কি কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার যে সব চিন্তাধারা তা আমাদের বলে। সে সম্পর্কে নরেনের স্পষ্ট ধারণা এবং চিন্তা ছিল। নরেন এই সমস্ত শাসন ব্যবস্থাতে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের পক্ষে ছিল যাতে জনসাধারণের মংগল এবং উন্নতির কাজে এই সব সংস্থাকে প্রয়োগ করা যায়।" সতীশবাবু আরও বলেনঃ "এই ধরণের ভাবধারা চিন্তা তখন অন্য কোন বিপ্লবীরা করতেন না। বিপ্লবীরা সাধারণতঃ ইংরাজ শাসকদের কিভাবে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া যায় তাই নিয়ে চিন্তা করতো।"(১১)

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ছাড়া পাবার পরই নরেন এবং যতীন মুখোপাধ্যায়—হরিকুমার চক্রবর্তী, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অন্যান্যদের সংগে আলাপ আলোচনা করে, যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সমস্ত দলকে একটি সংযুক্ত সংস্থার মধ্যে আনার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করেন। উদ্দেশ্য—সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি; যার পরিকল্পনা হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী অবস্থায় জেলের মধ্যে ঠিক হয়। ১৯১১ সালেই যতীন মুখোপাধ্যায় বৃন্দাবনে গিয়ে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামী) সংগে সাক্ষাৎ করে এই পরিকল্পনায় তাঁর সমর্থন নিয়ে আসেন।

(৯) ডঃ ভূপেন্দ্র দত্ত—অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, পৃঃ ২৫৫। পরবর্তীকালে জার্মানীতে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ডঃ ভূপেন দত্তকে বলেন যে, যতীন মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন নরেন ভট্টাচার্যই তাঁর শক্ত ডান হাত।
মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেনঃ "১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে কাজে নামিয়েছিলেন তিনিই (এম· এন· রায়)। [আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি· পৃঃ ৬১৩]

(১০) ডঃ ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের সহিত লেখকের সাক্ষাৎকার।

(১১) সতীশ চক্রবর্তীর সহিত লেখকের সাক্ষাৎকার।

নরেনও পরে পণ্ডিচেরী গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' এই পরিকল্পনায় তাঁর সমর্থন ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা চায় এবং অরবিন্দকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ফিরে আসার জন্য আবেদন করে। যুক্তি হিসাবে বলে যে, এই পরিকল্পনা তাঁরই (অরবিন্দের) পরিকল্পনা যা তিনি ১৯০৩ সালে যতীন মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন। কিন্তু অরবিন্দ প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা বিপ্লবের পথে আর ফিরে আসতে রাজী হ'ন না। এতে নরেন খুবই হতাশ হয়েছিল।(১২)

কিন্তু অরবিন্দের প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও নরেন এবং যতীন মুখোপাধ্যায় তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১২ সালেই ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্যাম-এ পাঠানো হয়—সেখানে ভবিষ্যতের জন্য কিছু যোগাযোগ করার জন্য এবং সাধারণভাবে অবস্থা দেখে আসার জন্য। ইতিমধ্যে অনুশীলন সমিতি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বিডন স্কোয়ারে একটি জাতীয় পাঠাগার (National Reading Society) গঠন করা হয় এবং জীবনতারা হালদারের বাড়ীতে জেলেটোলায় একটি ব্যায়ামাগার (Physical Culture Centre) খোলা হয়।(১৩) নরেনও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে।

১৯১৩ সালে এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে কলকাতা ময়দানে নরেন অনুশীলন সমিতির কয়েকজন নেতৃস্থায়ী সভ্যদের নিয়ে একটি গোপন বৈঠক করে। সন্ধ্যার দিকে এই সভাটি হয়। ডাঃ অশ্বিনী রায় লেখককে বলেনঃ "এই সব সভায় আমরা একটি ফুটবল নিয়ে গোল হয়ে বসতাম—যাতে করে' সাধারণের ধারণা হতো আমরা কোন ফুটবল ক্লাবের সভ্য এবং ক্লাবের ব্যাপারে আলোচনা করছি।"

এই রকম একটি সভায় নরেন আলোচনার শুরু করে' বলেঃ "আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা চুপ করে' বসে থাকবো না। অনুশীলন সমিতি এখন নেই। কিন্তু তার মানে কি

(১২) নির্বাণ স্বামীর সহিত লেখকের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে।
পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী (পরবর্তীকালে এম· এন· রায়ের রাজনৈতিক সহযোগী) লেখককে বলেন যে, এম· এন· রায় তাঁকে চল্লিশ দশকে বলেছিলেন—তিনি অরবিন্দকে এই সশস্ত্র বিপ্লবে উপদেশ এবং নেতৃত্ব দেবার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং সে কারণ পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন। অরবিন্দের প্রত্যাখ্যান রায়কে হতাশ করেছিল।

(১৩) জিতেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। জীবনতারা হালদার অনুশীলন সমিতির একটি ইতিহাসের রচয়িতা।

এই যে, দেশে যা ঘটছে তা দেখে আমরা চুপচাপ বসে থাকবো? কিছু করবো না?" নরেন ছাড়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনী রায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দু'জন যাঁদের নাম অশ্বিনী রায় স্মরণ করতে পারেন নি।

অশ্বিনী রায় তখন বলেনঃ নিশ্চয়ই বসে থাকবো না। কিন্তু আমাদের একজন নেতার প্রয়োজন। নেতা কোথায়?

নরেনঃ নেতা আমি পেয়েছি।

অশ্বিনী রায়ঃ কে তিনি?

নরেনঃ এখন তিনি আত্মপরিচয় দিতে চান না বা সকলের সামনে আসতে চান না।

অশ্বিনী রায়ঃ তা হলে আমরা কার কাছ থেকে আদেশ নেব?

নরেনঃ তাঁর আদেশ তোমরা আমার কাছ থেকে পাবে।

অশ্বিনী রায়ঃ তার মানে তুমিই নেতা।

এই সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি, কারণ নরেন নেতার নাম বলতে চায় নি। সভার শেষে ভোট নেওয়া হয়, তাতে দু'পক্ষই সমান হয়।(১৪) কিন্তু যেহেতু যতীন মুখোপাধ্যায় নরেনকে তাঁর নাম এখনই প্রকাশ করতে বারণ করে দিয়েছিলেন, সেজন্য নরেনের পক্ষে তখন তাঁর নাম প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। অশ্বিনী রায় আমায় বলেনঃ "যদি নরেন তখন যতীনদার নাম বলতো, সবাই সেই নাম সমর্থন করতো এবং মেনে নিতো।" এই কারণে বিপ্লবীদের সংহতির ব্যাপারটা কয়েক মাস পিছিয়ে যায়। সংহতি ঘটে ১৯১৩ সালে বর্ধমান ও মেদিনীপুরে দামোদরের বন্যার ত্রাণকার্যের সময়। সেই সময় সমস্ত বিপ্লবীরা ওখানে জড়ো হয় ত্রাণকার্যের জন্য। এবং তখন সবাই একযোগে এই নতুন বিপ্লবী সংগঠনের একটি রূপ দেয়।(১৫)

অশ্বিনী রায় আমাকে বলেনঃ "কোন পরিকল্পনা যখন নরেন ঠিক করতো তখন সে এক মনে সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে লেগে থাকতো, কোন বাধাই ও গ্রাহ্য করতো না। ঐ সভায় আমাদের ঝগড়া হয়, আমি ওর পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করি কিন্তু কয়েকদিন পরেই যখন আবার ওর সঙ্গে দেখা হয়, নরেন এমনভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করলো যেন কিছুই হয়

(১৪) ডাঃ অশ্বিনীলাল রায়ের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার।

(১৫) গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়– [Dynamics of Revolutionary Movement in India]
ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের গতি: পৃঃ ২৬।

নি। আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলুম এবং আনন্দিতও হয়েছিলুম। তখন আমার নরেনকে ধাঁধার মত মনে হয়েছিল।"

"ঐ সময় আমার বন্ধু ও সহযোগীরা আমাকে বিবাহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। তাদের বক্তব্য ছিল, বিয়ে করলে ক্রমাগত পুলিসের তাড়না থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। মনোরঞ্জন (পরে সুবিখ্যাত ন্যাট্যাভিনেতা) আমায় বলে, 'তুই হয় বিয়ে কর, আর না হয় থিয়েটারে অভিনেতা হয়ে যা।' মনোরঞ্জনের বক্তব্য ছিল যে. যদি আমি থিয়েটারে অভিনেতা হই তাহলে পুলিস ধরে নেবে যে, আমি বকে গেছি এবং আমাকে আর বিপ্লবী বলে' পিছু ধাওয়া করবে না। এই সব কথা যখন আমি চিন্তা করছি তখন নরেন একদিন আমার কাছে এসে বলেঃ "অশ্বিনী, তুই একটা বোকা। বিয়ে করলেই যদি পুলিসের পিছু ধাওয়া থেকে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহলে একটা বিয়েই করে' ফেল না? বিয়ে করাটাও আমাদের একটা ছদ্মবেশ ছাড়া তো আর কিছু নয়।' "

অশ্বিনী রায় বলেনঃ "আমার সব সময়েই মনে হতো নরেন ছিল প্রাচীন ঋষিতুল্য। ওর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মাতৃভূমিকে বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত করা এবং তার জন্য ও সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল এবং সেই কর্তব্য থেকে কেউ বা বা কোন কিছুই ওকে বিচ্যুত করতে পারতো না।"(১৬)

যতীন মুখোপাধ্যায় চাইতেন যে, বিপ্লবী সংগঠনকে বিকেন্দ্রিক রাখতে, কারণ যদি কোন একটি দল পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তাহলে অন্য দল তাদের কাজ করে' যেতে পারবে। সেইজন্য তিনি নিয়ম করেছিলেন যে, ছোট ছোট দলের নেতারাই অন্যান্য দলের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং যোগাযোগ রাখবে; কর্মীদের সঙ্গে কর্মীদের পরিচয় থাকবে না। একটি দলের নেতা অপর দলের কে কে কর্মী তাও জানতে চাইবে না। প্রতিটি দল এইভাবে তাদের কার্যকলাপ একদম গোপন রাখবেন।

কিন্তু যখন সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা গৃহীত হলো তখন নরেন বললো যে, সমস্ত দলকে কেন্দ্রীভূত করে' একটি এককেন্দ্রিক নেতৃত্ব গঠন করা প্রয়োজন। নরেন তার এই বক্তব্য একমাত্র যতীন মুখোপাধ্যায়কেই বলে এবং তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে। যতদিন না যতীন মুখোপাধ্যায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ততদিন নরেন তার বক্তব্য তার নিজের মধ্যেই রেখেছিল। তাই যতীন মুখোপাধ্যায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পরই নরেন সমস্ত

(১৬) ডাঃ অশ্বিনীলাল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

দলকে একটি নেতৃত্বের অধীনে আনবার কাজে লেগেছিল। কিন্তু যেহেতু যতীন মুখোপাধ্যায় তখনও তাঁর নামটি জানাতে বারণ করেছিলেন তাই নরেন তখন ওঁর নামটি বলতে পারে নি। নরেন জানতো যে, একমাত্র যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই সমস্ত দলকে একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আওতায় আনা সম্ভব। যতীন মুখোপাধ্যায়ও জানতেন যে, একমাত্র নরেনের পক্ষেই এই-রকম একটি সংগঠন করা সম্ভব। তাই নরেনই হলো এই দলের প্রকৃত নেতা। সমস্ত উপনেতারা তাকেই জানতো এবং তার সঙ্গেই কথাবার্তা বলতো ও পরিচিত ছিল। যতীন মুখোপাধ্যায় থাকতেন সবার আড়ালে। যতীন মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত আদেশ নরেন এমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতো এবং কার্যকরী করতো তাঁর নাম প্রকাশ না করে যে, অনেক ক্ষেত্রেই নরেনকে অনেক বিপ্লবী কর্মীর বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

এই সময়টি ছিল আবার এমন যখন বিপ্লবীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। সতীশ চক্রবর্তী আমাকে বলেনঃ "তখন সমস্ত বৈপ্লবিক কাজকর্মই প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে; বিপ্লবীরা হতাশায় ভুগছেন। এই সময় নরেন এগিয়ে এসে সবাইকে কাজে লাগালো এবং সংগঠনের রূপ দিল।"(১৭)

ঐ সময়ের কথা বলতে গিয়ে হরিকুমার চক্রবর্তী লিখেছেনঃ "যতীন্দ্র-নাথ বা যুগান্তর দল এত অল্প সময়ে যে সার্থক রূপ নিয়েছিল তা নরেন ছাড়া সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ। যুগান্তর সংগঠনটি নরেনের হাতেই তৈরী; যতীন্দ্রনাথ তাতে প্রাণসঞ্চার করে এবং সম্মানিত করে' তোলে।"

(১৭) সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

সাত: সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি

বাঙলার বিপ্লবীরা একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, যখন ইংলণ্ড বিপদের সম্মুখীন হবে তখনই ভারতবর্ষের সুযোগ আসবে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করা। সেই হিসাব মত যে সব দেশ ইংলণ্ডের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয় যাতে দেশের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য গেরিলা যুদ্ধ শুরু করা যায়।

১৯০৬ সালে বারীন ঘোষের সঙ্গে বিরোধ হওয়ার ফলে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং বৃন্দাবন ও পাঞ্জাবে ঘুরে ঘুরে বিপ্লব প্রচার করেন। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময় অজিত সিং এবং তাঁর ভাই, শহীদ ভগত সিং-এর পিতা, কিষেণ সিং-কে বিপ্লবে উজ্জীবিত করেন। লালা হরদয়াল বিদেশ থেকে পড়াশুনা শেষ করে ১৯০৮ সালে দেশে ফেরেন এবং কিষেণ সিং-এর কাছে বাংলার বিপ্লবীদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। ১৯১১ সালে হরদয়াল আমেরিকা যান এবং সেখানে গদর(১) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং 'যুগান্তর আশ্রম'(২) নামে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ হরদয়ালকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে আমেরিকান গভর্ণমেন্ট গ্রেপ্তার করে, তখন হরদয়াল ওখান থেকে সুইজারল্যাণ্ড চলে যান। হরদয়াল ইতিমধ্যে অনেক আমেরিকান বুদ্ধিজীবী এবং ভারতীয়দের বিপ্লবী সংগঠনে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যেই একজন আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় রামচন্দ্র যুগান্তর আশ্রম এবং গদর পত্রিকার ভার নিয়ে চালাতে থাকেন। সেই সময় আরও দুজন ভারতীয় পিংলে এবং সত্যেন সেন ওঁর সঙ্গে যোগ দেয়। সত্যেন সেনকে যতীন মুখোপাধ্যায় আমেরিকা পাঠান গদর পার্টীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে।(৩)

(১) ডাঃ যাদুগোপাল: পৃঃ ৩১ [গদর-এর অর্থ বিপ্লব]।

(২) 'যুগান্তর আশ্রম' নামটি বাংলার যুগান্তর দল থেকেই নেওয়া।

(৩) পৃথ্বীন মুখোপাধ্যায় রচিত পূর্বোল্লিখিত যতীন মুখোপাধ্যায়ের জীবনী সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত: পৃঃ ১২৪৫।

১৯১৩ সালে আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সভায় হরদয়াল বলেনঃ "জার্মানী ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি করছে। ভারতবর্ষের এখন সুযোগ এসেছে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার"। গদর পার্টী প্রথমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমেরিকায় বসবাসকারী শিখদের ভারতবর্ষে পাঠিয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করা। পরে, গদর পার্টী ও জার্মানরা পরামর্শ করে' বার্লিনে একটি 'ভারতীয় স্বাধীনতা কমিটি" গঠন করে' মিলিতভাবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রয়াত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভ্রাতা ধীরেন সরকার বাংলার বিপ্লবীদের কাছে এই খবর পাঠায় যে, যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে জার্মানী ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করবে।(৪)

১৯১৪ সালের ৬ই মার্চ "বার্লিনের টাগেব্লাট" নামে একটি জার্মান পত্রিকা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে, যে প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল, ইংলণ্ডের রাজকর্মচারীরা কল্পনাও করতে পারছে না যে, ইংলণ্ডের দিন শেষ হয়ে আসছে, (ভারতবর্ষের মধ্যে) 'এখন একটি প্রকৃষ্ট বৈপ্লবিক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।' আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, স্যান ফ্রান্সিসকোয় একটি সংগঠিত প্রচেষ্টা এই সময় শুরু হয়ে যায় ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র পাঠানোর।

১৯১৪ সালের মাঝামাঝি থেকে নরেন ভট্টাচার্য জার্মান কনসালেটের মাধ্যমে জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে থাকেন। এই যোগাযোগ স্থাপিত হয় একজন জার্মান শিক্ষানবিশের সাহায্যে। এই যোগাযোগ কিভাবে হয় সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের শেষদিনে সে কথা তিনি আমাকে বলেন। সেই সময় ভাল ছাত্ররা প্রায় প্রতি রবিবার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যেত। সতীশবাবুও যেতেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিস্ট্রার, সংস্কৃতে পণ্ডিত, জি· থিবোও আসতেন। থিবো সতীশ চক্রবর্তীকে বলেন জার্মান কনসালেটের কলিকাতাস্থ রাষ্ট্রদূত বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আগ্রহী। সেই মত সতীশবাবু নরেন ভট্টাচার্যকে খবরটি দেন এবং থিবোর মারফৎ এই যোগাযোগটি স্থাপিত হয়। নরেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর, নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়কে খবর দেয় এবং তারপর দু'জনে একসাথে পুনরায় জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এরপর অনেকগুলি বৈঠক হয় যুদ্ধ লাগার ঠিক পূর্বে এবং সেই সব বৈঠকে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র কিভাবে আসবে এবং কিভাবে বিদ্রোহ সংগঠিত হবে তার পরিকল্পনা তৈরী হয়। এই সব বৈঠকে আর একজন যিনি পরে যোগ দেন তিনি হলেন অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, যতীন মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী।

(৪) ডাঃ যাদুগোপাল, পৃঃ ৪২১।

১৯১৪ সালের শুরু থেকে নরেন অন্যান্য চাকরী ছেড়ে একটি রেস্টুরেন্ট খোলে, 'হ্যারি এণ্ড সন্স'-এর অফিসের কাছে।(৫) রেস্টুরেন্টে নরেন জাহাজের নাবিকদের এবং ফোর্ট উইলিয়মের সৈন্যদের জন্য বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরী করতেন। এই রেস্টুরেন্টটিকে রায় সেনাদের একটি আড্ডা করেছিলেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য, খবরাখবর আদান-প্রদান করার জন্য এবং কিছু কিছু অস্ত্র যোগাড় করার জন্য—বিদ্রোহের প্রস্তুতি হিসাবে।

১৯১৩ সাল থেকেই কানাডায় বসবাসকারী শিখদের মধ্যে একটি অসন্তোষ জমে উঠেছিল। এই অসন্তোষের কারণ ছিল কানাডার প্রিভী কাউনসিলের (সর্বোচ্চ আদালত) একটি আদেশ—যে আদেশের বলে শিখদের স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের কানাডায় আনা বন্ধ করা হয়েছিল। কানাডার এই আদেশে ভারত-বর্ষ থেকে কোন নতুন লোককেও কানাডায় গিয়ে বসবাস করা বন্ধ করা হয়। জাহাজ কোম্পানীগুলি তখন ভারতীয়দের কানাডায় নিয়ে যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। সেই সময় গুরুদত্ত সিং নামে মালয় ও সিঙ্গাপুরের এক ব্যবসায়ী এই আদেশকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে। জাহাজটির নাম ছিল 'কামাগাটামারু'। এই জাহাজে প্রায় ৫০০ শিখ যাত্রী নিয়ে তিনি কানাডায় যাত্রা করেন। গদর পার্টী এই যাত্রীদের সঙ্গে যোগা-যোগ করে এবং তাদের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করে। শিখদের কিন্তু কানাডায় নামতে দেওয়া হয় না। তখন ওঁরা ঐ জাহাজেই কলকাতার কাছে বজবজে আসে। জাহাজটি বজবজে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৪ সালে এসে পৌঁছয়।

(৫) ১৯৪৩-৪৪ সালে একদিন এম. এন. রায় এলেন এবং আমি গাড়ীতে আসছি। গাড়ীটি সুরেন ব্যানার্জী রোড এবং চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে সুরেন ব্যানার্জী রোডের ওপর দাঁড়িয়েছে, আমি রায়কে দেখাই 'অনাদি কেবিন'। রায় তখন বলেন, 'খবর নিও তো এই অনাদি কি মেদিনীপুরের লোক। আমি যখন ডালহৌসি স্কোয়ারে রেস্টুরেন্ট করেছিলুম তখন আমার একজন সহকর্মী ছিল, ভাল রাঁধতো, তার নাম ছিল অনাদি।' অনাদি কেবিনের মালিককে পরে আমি জিজ্ঞাসা করি; তিনি বলেন, "না, নিশ্চয়ই অন্য কোন অনাদি হবে।" রায় যে ভাল রান্না করতেন এবং রান্না করাটা রায়ের একটা অন্যতম নেশা ছিল, একথা আমায় সম্প্রতি বলেন এ. সি. এন. নাম্বিয়ার। গত ১১ই অক্টোবর ১৯৮২ তাঁর সঙ্গে আমার সুইজার-ল্যাণ্ডে জুরিখ শহরে দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, রায় এবং তিনি বার্লিনে মুনজেনবার্গের বাড়ীতে বহুদিন ছিলেন। তিনি বলেন রায় সমস্ত দিন কাজ ও পড়াশুনা নিয়ে থাকতেন। সন্ধ্যার সময় রায়ের একটি নেশা ছিল রান্না করার।

বৃটিশ সরকার এই শিখদেব এক বন্ধ ট্রেনে বোম্বাই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শিখরা তাতে আপত্তি জানালে বৃটিশ সেনা ও শিখদেব মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ হয়। দু পক্ষই বন্দুক চালায়। তখন বৃটিশ সরকার ওদের কলকাতাতেই জোর করে নামিয়ে দেয়। এই খণ্ডযুদ্ধে বহু শিখ হতাহত হয়। গুরুদত্ত সিং কিন্তু পালাতে সমর্থ হয় এবং আরও ২৮ জনকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয়। নরেনের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সাতকাড়ি বন্দোপাধ্যায় এই শিখদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

এই শিখদের সঙ্গে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল। এই ঘটনাটি বিপ্লবীদের মধ্যে এক নতুন সাড়া এনে দেয়। তখন থেকেই গদর পার্টি এবং বাংলার বিপ্লবীরা একযোগে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে থাকে।

এই ঘটনার পূর্বেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এর পর নরেন জার্মান কনসালের সঙ্গে আর এক দফা আলাপ আলোচনা শুরু করে। জার্মান কনসালেট মারফৎ তখন বাংলার বিপ্লবীদের কাছে খবর আসে যে জার্মানরা সাহায্য করতে প্রস্তুত এবং সেই সাহায্য গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে। নরেন তখন বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীকে একত্র করে যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি বড় দল গঠন করতে সক্রিয় হয়ে উঠলো। যতীন মুখোপাধ্যায়কে ইতিমধ্যে কলকাতায় আনা হয়েছে। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা থেকে খালাস পাবার পর যতীন মুখোপাধ্যায়ের সরকারী চাকুরীটি যায়। তখন থেকে তিনি কলকাতার বাইরে ঠিকাদারী কাজ করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে তার দলের লোকদের উপদেশ দিতেন। যখন কলকাতায় আসতেন তখন তিনি বিডন স্ট্রীটের নিকটে ২ নং চেদাম মদন লেনে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীতে থাকতেন)।

এই সময় বিভিন্ন দলের একটি গোপন সভায় যতীন মুখোপাধ্যায়কে সর্বাধিনায়ক নির্বাচন করে একটি বিপ্লবী বাহিনী গঠন করা হয়। কিন্তু দলের কোন নাম দেওয়া হয় না। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ জার্মানীর ইণ্ডিয়া কমিটি থেকে আমেরিকা মারফৎ আমাদের নিকট খবর পৌঁছায়, সেই সঙ্গে জার্মানীর সাহায্য পাওয়ারও আশা পাওয়া যায়। এই খবর পাওয়ার পর বাংলার সব দলগুলি মিলিত হয়। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হন।"(৬) দলের কোন নাম দেওয়া হয় না

ডাঃ যাদুগোপাল—পৃঃ ৩৮২। এম এন রায় তার 'আত্মকথা'-য় লিখেছেন ঃ গোপন সভা ডেকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য যতীন মুখোপাধ্যায়ের সর্বাধিনায়কত্বে একটি জেনারেল স্টাফ গঠিত হয়। (স্মৃতিকথা পৃঃ ৩)।

কিন্তু 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা বা বুলেটিন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।(৭) দলটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'যুগান্তর' পার্টী হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে যায়। একটি মাত্র গোষ্ঠী যুগান্তর পার্টীতে যোগ দিতে অস্বীকার করে, সেটি হলো ঢাকার অনুশীলন সমিতি।(৮) এই ধরণের সশস্ত্র বিপ্লব সার্থক হওয়া সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহ ছিল।

আরও একজনের এই পরিকল্পনাটি সার্থক হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, তিনি হলেন সতীশ সরকার যিনি পরে নির্বাণ স্বামী বলে' পরিচিত হন। নির্বাণ স্বামীর মতে "এই ধরণের গেরিলা যুদ্ধের সার্থকতার জন্য যে দুটি প্রস্তুতির প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব ছিল। এক, যানবাহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অকেজো করার ক্ষমতা, দুই, জনসাধারণের সমর্থন, যাতে করে' প্রয়োজন হলে বিপদের সময় বিপ্লবীরা লুকিয়ে থাকার জন্য তাদের সাহায্য পায়। এই সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল গ্রাম এলাকায়।"(৯) নির্বাণ স্বামী লেখককে বলেন যে, এর পূর্বে যখন যতীন মুখোপাধ্যায় আর একবার এইরকম গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি নিরালম্ব স্বামীকে (যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) বলে' যতীন মুখোপাধ্যায়কে ঐ প্রচেষ্টা থেকে বিরত করেন। কিন্তু এইবার সেটা সম্ভব হয় নি, কারণ নরেন যতীন মুখোপাধ্যায়কে যুক্তি দিয়ে বোঝায় যে, রেলপথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং সব প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার প্রস্তুতি করা হবে। তাছাড়া, নরেন আরও বলে যে, অস্ত্র পাওয়া গেলে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে' তোলা সম্ভব হবে এবং সেই সশস্ত্র বিপ্লবীবাহিনীকে জনসাধারণ সমর্থন জানাবে, সাহায্য করবে। নরেনের এই যুক্তিতেই যতীন মুখোপাধ্যায় ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করতে এগিয়ে আসেন, এবং তিনি নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে দেখা করে' তাঁরও সমর্থন পান।

নরেন তার যুক্তির সমর্থনে আরও বলে, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা এত কমে যাবে যে, যে স্বল্পসংখ্যক বৃটিশ সৈন্য ভারতবর্ষে থাকবে তাদের পক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবীবাহিনীকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, বাইরে থেকে যাতে নতুন সৈন্য বৃটিশ শাসকরা ভারতবর্ষে না আনতে পারে তারও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হবে। আর যে সব ভারতীয় সৈন্য বৃটিশ বাহিনীতে যুক্ত আছে, সেই সব ভারতীয় সৈনদের বিপ্লবের সমর্থনে কাজে লাগানোও সম্ভব হবে। নরেন বলে, সেই কাজ আমরা ইতিমধ্যেই

(৭) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(৮) ডাঃ যাদুগোপাল, পৃঃ ৩৭২।
(৯) নির্বাণ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

শুরু করেছি; এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেছে।(১০)

যতীন মুখোপাধ্যায় এই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করার পরেই নরেন প্রস্তুতির কাজে পুরোদমে লেগে যায়। প্রথম যে কাজে নরেন মনোযোগ দেয় সেটি হলো যতীনদাকে একটি নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখা এবং তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা করা। বালেশ্বরের নিকটবর্তী কপ্তিপোদায়—বালেশ্বর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে—জঙ্গলের মধ্যে একটি পুরানো বাড়ীতে নরেন যতীনদার থাকার ব্যবস্থা করে। এখানে তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন থাকবে, এবং এঁরা সকলে 'আনন্দমঠ'-এর সন্তানদের নাম নেবে।

যতীনদার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের উপর চক্রধরপুর স্টেশনে একটি কাপড়ের দোকান খোলা হয়। তার অল্প দূরেই ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়—যিনি শ্যাম থেকে কিছুদিন আগে প্রত্যাবর্তন করে-ছেন—তাঁকে দিয়ে আর একটি দোকান খোলানো হয়। বালেশ্বরে একটি সাইকেলের দোকান খোলা হ'ল, 'ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে যেটি চালাবার জন্য চাংড়িপোতার শৈলেশ্বর বসুকে পাঠানো হয়। সম্বলপুরেও একটি গোপন ঘাঁটি তৈরী হলো। এসবই বিপ্লবের প্রস্তুতি হিসাবে এবং প্রয়োজনে যানবাহন, রেল, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য।

অন্যদিকে, যতীন মুখোপাধ্যায়কে কলকাতায় আনার পরেও জার্মানদের সঙ্গে অস্ত্র আমদানীর ব্যাপারটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তখন কলকাতায় একটি গোপন বৈঠকে রডা কোম্পানীর আমদানী অস্ত্রশস্ত্র লুঠ করার পরি-কল্পনা তৈরী হয়। লুঠ করার দু'দিন আগে ছাতাওয়ালা গলির কাছে বৌবাজারের একটি ছোট্ট পার্কে একটি বৈঠক হয় কিভাবে পরিকল্পনাটি কার্যকরী করা হবে তা ঠিক করার জন্য। এই বৈঠকে ছিলেন নরেন আশু রায়, নরেন ঘোষ চৌধুরী, শ্রীশ পাল, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, হরিদাস দত্ত এবং শ্রীশ মিত্র (ওরফে হাবুল) যিনি রডা কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন।(১১) শ্রীশ মিত্রই খবর আনেন যে, রডা কোম্পানীর অনেক রাইফেল এবং গুলি-গোলা বিদেশ থেকে এসেছে। এই বৈঠকে ঠিক হয় যে, বিপ্লবীরা একটি গরুর গাড়ী নিয়ে যাবে রডা কোম্পানীর গুদামে এবং শ্রীশ মিত্র অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের ঐ গরুর গাড়ীতে তুলিয়ে দেবে। বিপ্লবীরা বিভিন্ন জায়গায় সেই অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করবে।

(১০) নির্বাণ স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(১১) হরিদাস দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ "১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট, বুধবার, রডা কোম্পানীর কর্মচারী শ্রীশ মিত্র, যার উপর দায়িত্ব ছিল ঐ অস্ত্রশস্ত্র শুল্ক দপ্তর থেকে ছাড়ানোর, তিনি ২০২ বাক্স অস্ত্রশস্ত্র খালাস করেন কিন্তু কোম্পানীর ভ্যান্সিটার্ট রো'র গুদামে ১৯২ বাক্স মাল পৌঁছে দিয়ে তিনি 'বাকি মাল আনতে যাচ্ছি' বলে' চলে যান। তিনি আর ফেরেন না এবং তিনদিন তিনি না ফেরার পর ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়। যে ১০টি বাক্স আসেনি তাতে ৫০টি মজার পিস্তল এবং ৪৬,০০০ গুলি ছিল। এই পিস্তলগুলি খুবই বড় মাপের এবং পিস্তলগুলি এমনভাবে তৈরী যে তার পিছনে কাঠের হাতল লাগালে সেগুলি কাঁধে ভর দিয়ে রাইফেল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।"(১২)

এই ৫০টি পিস্তলের মধ্যে ২৫টি রাখা হয় উত্তর কলকাতার জগদীশনাথ রায় লেনে যেখানে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের ভাগ্নে জিতেন্দ্রকুমার বসু(১৩) থাকতেন এবং বাকি ২৫টি খড়দার একটি মন্দিরে যার পুরোহিত ২ নং ছিদাম মুদী লেনে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের বাড়ীর পিছনেই থাকতেন। অতুলকৃষ্ণ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরকৃষ্ণ ঘোষ লেখককে বলেন, "গভীর রাতে দরজায় টোকার আওয়াজ শুনে দেখি মুটের বেশে দু'জন লোক কাঠের বাক্স নিয়ে দাঁড়িয়ে। চিনতে একটু সময় লাগলো, নরেনদা আর দাদা। রাত্রেই মালগুলি পুরুতমশায়ের বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি তো ভয়েই অস্থির, কিন্তু তারপর দিন মালগুলি গোপনে অতি সন্তর্পণে খড়দার মন্দিরে রেখে আসা হয়। পরে আবার মালগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হয়, পুরুত মশায়ের ভয়ের জন্য। তাছাড়া পুলিশও চারদিকে তল্লাশী চালায়। যুগান্তর এবং অনুশীলনের ঝগড়া এই সময় তুঙ্গে যেজন্য অনুশীলন সমিতির সম্পাদক পুলিন মুখোপাধ্যায় অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে অস্বীকার করেন।"(১৪) এই সময় থেকে নরেনের ওপরই অনুশীলন সমিতির রোষ বেড়ে যায়, কারণ সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টার মুখ্য ভূমিকা ও দায়িত্ব ছিল নরেনের ওপর। যখন পুলিনবাবু শুনলেন যে, এই অস্ত্র লুঠের সঙ্গে নরেন জড়িত তখন অমরকৃষ্ণ ঘোষের কাছে তিনি নরেন সম্পর্কে খুব বিরূপ মন্তব্য করেন। অমরকৃষ্ণ ঘোষকে পুলিনবাবুর কাছে সাহায্যের জন্য যখন পাঠানো হয় তখনই পুলিনবাবু ঐসব কটূক্তি করেন।(১৫)

---

(১২) সিডিশন কমিটির রিপোর্ট, পৃঃ ৬৬।

(১৩) এ্যালজেব্রা লেখক কে· পি· বসুর পুত্র।

(১৪) অমরকৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(১৫) —ঐ—

ঐ পিস্তলগুলি তখন খুবই কাজে আসে। এক, যতীনদার আত্ম-গোপনের জন্য সশস্ত্র প্রহরীর প্রয়োজন হয়েছিল; দুই, বিপ্লবের অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করার ব্যাপারে। সেজন্য পিস্তলগুলি বিপ্লবীদের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বিলি করে' দেওয়া হয়। সিডিশন কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী "৪৪টি পিস্তল অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের ৯টি কেন্দ্রে পাচার করা হয়, এবং এই পিস্তলগুলি ৫৪টি ডাকাতি, খুন অথবা ডাকাতির প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত হয়।"(১৬)

একদিন গৌরাঙ্গ প্রেসে হঠাৎ বৃটিশ পুলিশ অফিসার চার্লস টেগার্ট এসে দরজায় টোকা মারেন। প্রেসবাড়ীর তিনতলায় তখন নরেন এবং সুরেশ মজুমদার গোপন আলোচনায় মগ্ন—টেবিলের ওপর দুটি মজার পিস্তল এবং সুন্দরবনের একটি ম্যাপ। ওরা খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কিন্তু নরেন সুরেশ মজুমদারকে দরজা খুলতে বলে' পিস্তল দুটির উপরে একটি খবরের কাগজ ঢাকা দিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা টেগার্ট সাহেবের সঙ্গে কথা বলে। টেগার্ট বোধ হয় বিশ্বাস করেই চলে' যায় যে, ওরা ছাপাখানার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজেই ব্যাপৃত ছিল, বিপ্লবের পরিকল্পনার কাজে নয়।

এই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসটি বিপ্লবের প্রচার এবং ব্যবসা দুই উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসটি করার জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়া স্বর্গতা সরলাবালা সরকার(১৭) এবং তাঁর ভাই ডাঃ সরসীলাল সরকার ৪০০০, টাকা দেন। প্রেসের কাজ শিখতে নরেন যায় পাটনায় এবং সুরেশ মজুমদার শিক্ষানবীশি করে কলকাতার একটি সাহেবের প্রেসে।(১৮)

১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে সত্যেন সেন জাপান হয়ে কলকাতায় ফেরেন। জাপানে তিনি সান ইয়াৎ সেনের সংগেও দেখা করেন এবং অস্ত্র-

(১৬) সিডিশন কমিটির রিপোর্ট, পৃঃ ৬৬।

(১৭) সরলাবালা সরকারকে নরেন ও পরান (সুরেশ মজুমদার) 'মা' বলতেন এবং তিনিও ওঁদের নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। দীর্ঘ ১৬ বছর বাইরে থেকে নরেন ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশে ফেরেন এবং ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে ১৯৩৬ সালের ২০শে নভেম্বর ছাড়া পাবার পর নরেন প্রথমবার কলকাতায় এসে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে সুরেশ মজুমদারের সংগে কয়েকদিন থাকেন। পরে তিনি অতুলকৃষ্ণ ঘোষের বাড়িতে থাকেন।

(১৮) ডাঃ সরসীলাল সরকারের পুত্র, আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম পরিচালক কানাইলাল সরকারের সংগে সাক্ষাৎকার। সরলা দেবীর পুত্র 'প্রফুল্লকুমার সরকার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

শস্ত্র কেনার ব্যাপারেও কথাবার্তা বলে' আসেন। সত্যেন সেনও খবর নিয়ে আসেন জার্মান সরকার বাঙ্গালী বিপ্লবীদের অস্ত্র-সাহায্য দিতে আগ্রহী। ফেরার পথে জাহাজে সত্যেন সেনের সঙ্গে পিংলে এবং আরও অনেক শিখ সহযাত্রীদের আলাপ পরিচয় হয়। কলকাতায় ফিরে সত্যেন সেন পিংলে এবং শিখদের নেতা কর্তার সিং-এর সঙ্গে নরেন ও যতীন মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় করিয়ে দেন। নরেন এবং যতীন মুখোপাধ্যায় কর্তার সিংকে রাসবিহারী বসুর নিকট পাঠিয়ে দেন। রাসবিহারী বসু তখন কাশীতে বসবাস করছিলেন। পিংলে রাসবিহারী বসুকে বলেন যে, আমেরিকা থেকে ৪০০০ শিখ বিপ্লবের প্রয়োজনে দেশে এসেছেন এবং বিপ্লব শুরু হলে' আরও ২০,০০০ শিখ দেশে প্রত্যাবর্তন করবে।(১৯)

দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার পর থেকেই রাসবিহারী বসু কাশীতে এসে বসবাস করছিলেন। পিংলে ওঁর সঙ্গে কাশীতে দেখা করার পর, রাসবিহারী বসু পিংলের সঙ্গে লাহোরে যাবার জন্য তোড়জোড় করেন এবং যতীন মুখোপাধ্যায় ও নরেন ভট্টাচার্যকে কাশীতে এসে দেখা করার জন্য অনুরোধ করে' পাঠান।

ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেনঃ "১৯১৪ সালে রাসবিহারী 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলার ফলে কাশীতে বাস করতে থাকেন। পিংলে যতীনদার কাছ থেকে খবর নিয়ে যায়; রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করে' ও বলে যে, চার হাজার বিপ্লবী আমেরিকা থেকে পাঞ্জাবে এসেছে। কাজ আরম্ভ হলে আরো বিশ হাজার জন আসবে। এর ফলে রাসবিহারী শচীন সান্যালকে পাঞ্জাব ঘুরে আসতে পাঠান। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে শচীন পিংলে-সহ পাঞ্জাব থেকে ফিরে আসে।"

"রাসবিহারী শচীন ও পিংলে সহ লাহোরে যেতে মনঃস্থ করেন। দামোদর স্বরূপ নামে এক স্কুল মাস্টারকে এলাহাবাদের ভার দেওয়া হয়। পরে শচীন ফিরে এসে কাশীর ভার নেয় এবং নলিনী মুখার্জীকে জব্বলপুর পাঠায়। কাশী থেকে যাবার আগে রাসবিহারী যতীন্দ্রনাথ ও নরেন ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠান।"(২০)

(১৯) বিমানবিহারী মজুমদার—Militant Nationalism in India—পৃঃ ১৬৭।

(২০) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি; ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, কলিকাতা,

কাশীতে বৈঠকে মিলিত হ'ন রাসবিহারী বসু, যতীন মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ এবং নরেন ভট্টাচার্য। এই বৈঠকেই সশস্ত্র বিদ্রোহের একটি পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। যতীন মুখোপাধ্যায়ের উপর বাংলার ভার দেওয়া হয়, রাসবিহারী নেন উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের, এবং ঠিক হয় যে, ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ শুরু হবে।(২১)

ঠিক হয় যে, রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে অমৃতসরে পাঞ্জাব মেল আটকে দেওয়া হবে এবং সেইটাই হবে বিদ্রোহের সংকেত। পাঞ্জাব মেল এসে না পেঁছিলে বুঝতে হবে পাঞ্জাবে অভ্যুত্থান হয়েছে। সেই বুঝে বাংলাও কাজ শুরু করে দেবে।

এই বৈঠকের পর বাংলার দল ফোর্ট উইলিয়মে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে পরিকল্পনা অনুযায়ী যোগাযোগ স্থাপন করে। মহারাষ্ট্রেও একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ঐ কেন্দ্রের ভার নেন বিনয়ভূষণ দত্ত, ভীম রাও এবং বীর সাভারকরের ভ্রাতা যিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়ছিলেন। খিদিরপুরের স্কুল-মাস্টার আশুতোষ ঘোষকে দিয়ে পাঞ্জাবের সঙ্গে আর একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হয় যাতে করে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হলেও ঐ দ্বিতীয় সূত্রে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হবে। ফোর্ট উইলিয়মের ভারতীয় সৈন্যরা এই পরিকল্পনায় সাড়া দিয়েছিল। সত্যেন মিত্র, যিনি পরে বেঙ্গল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি, নাগপুরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন।(২২)

কাশী থেকে ফিরে এসেই বিপ্লবের প্রয়োজনে টাকা তোলার জন্য কয়েকটি ডাকাতির পরিকল্পনা হয়। নরেন এগুলির ভার নেন। কারণ ফিরে এসে যতীন মুখোপাধ্যায় নরেনকে বলেন যে, অন্তত এক লক্ষ টাকার প্রয়োজন বিপ্লবকে রূপায়িত করতে। নরেন, পরবর্তীকালে এম· এন· রায়, তাঁর 'স্মৃতিকথা'-য় লিখেছেন: "বিপ্লবের প্রাথমিক স্তরের প্রয়োজনের জন্য টাকা তোলার দায়িত্ব আমার উপর দেওয়া হয় এবং সেটি ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী তোলা হয়েছিল।"(২৩)

(২১) —ঐ— পৃঃ ৩৮৪।
(২২) —ঐ— পৃঃ ৩৮৫।
(২৩) এম· এন· রায়—মেময়েস (স্মৃতিকথা), পৃঃ ৩। ভারতবর্ষে ফেরার পর ৬ বছর কারাদণ্ড ভোগ করে এম· এন· রায় ৩০শে নভেম্বর ছাড়া পান এবং

অনেকে, এবং পূর্বে যতীন মুখোপাধ্যায় নিজেও, ডাকাতি করে' টাকা তোলার বিরোধী ছিলেন নীতিগত কারণে; কিন্তু এই সময় যতীন মুখোপাধ্যায় যুক্তি দেন যে, কলকাতা শহরে ডাকাতি করে' টাকা তুললে বৃটিশ সরকারের অনেকখানি সম্মানহানি হবে এবং একটা সাড়া জাগবে যা' বিপ্লবের পক্ষে সমর্থন তৈরী করবে। তাছাড়া, তিনি বলেন, বিপ্লবের প্রচারের দিক থেকে কলকাতা শহরের বুকের উপর একটি ডাকাতি, মফঃস্বলের ১০টি ডাকাতির সমান।(২৪)

গার্ডেনরীচ ডাকাতি

ডাকাতি করে' টাকা তোলার ব্যাপারে গার্ডেনরীচ ডাকাতি বোধ হয় সব থেকে রোমাঞ্চকর ঘটনা, যা তখনকার সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৫ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী দিনদুপুরে বড় রাস্তার উপর নরেন ও তাঁর আর দুই সঙ্গী বার্ড কোম্পানীর টাকা নিয়ে যাচ্ছিল যে গাড়ীটি সেটিকে পিস্তল দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে টাকা নিয়ে আর একটি গাড়ীতে পালিয়ে যায়। মোটর গাড়ীতে করে' ডাকাতি এই প্রথম। এই ডাকাতিটি কয়েক মিনিটের মধ্যে নরেন সম্পন্ন করে। পিস্তল দেখিয়েই কাজ হয়, গুলি ছুঁড়তে হয় নি।

এর পর, পর পর কয়েকটি ডাকাতি হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী বেলেঘাটায়, কর্পোরেশন স্ট্রীট (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী স্ট্রীট), গ্রে স্ট্রীট, টালা এবং আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে ডাকাতি হয়।

শুধু গার্ডেনরীচ ডাকাতি থেকে বিপ্লবীদের তহবিলে ১৮,০০০ টাকা আসে। ঠিক হয় যে, পরের দিন নরেন নিজে টাকা নিয়ে যতীন মুখোপাধ্যায়ের কাছে যাবে এবং কিভাবে এই ডাকাতি সম্পন্ন করা হয়েছিল তা' বলবে। সেই মত যতীন মুখোপাধ্যায় মির্জাপুর স্ট্রীটে দ্বারকানাথ বিদ্যা-

তখন তিনি 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকার আর্থিক প্রয়োজনে তাঁর অনুগামীদের তিনি একটি বিশেষ সভায় তিরিশের দশকের শেষ দিকে দুঃখ করে' বলেনঃ "যতীনদা শুধু মাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, বিপ্লবের জন্য তাঁর এক লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আমরা তৎক্ষণাৎ সেই টাকা তোলবার জন্য কাজে নেমে যাই এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশী টাকা তাঁকে তুলে দিই। সেই আদর্শবাদী মনোভাব এখন কোথায়?"

(২৪) ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ভূষণের বাড়ীতে অপেক্ষা করেন। এখানেই ফণী চক্রবর্তী থাকতেন। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও নরেন আসে না। যতীন মুখোপাধ্যায় অস্থির হয়ে ওঠেন। এই সময় বিপিন গাঙ্গুলী, যিনি ঐ ডাকাতিতে নরেনের সহযোগী ছিলেন তিনি, আসেন এবং বলেন, "নরেন পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য একটু ঘুরে আসছে।" কিছুক্ষণ পর খবর পাওয়া যায় যে, কাঁটাপুকুর লেন দিয়ে আসার সময় নরেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ ইন্স-পেক্টর সুরেশ মুখার্জী নরেনকে চিনতে পারে ও গ্রেপ্তার করে।

এই খবর পেয়ে যতীন মুখোপাধ্যায় এত অস্থির হয়ে পড়েন যে তিনি ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে হেঁটে চলে যান। যাদুগোপাল লেখককে বলেন, এই প্রথম যতীন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর সামনা-সামনি দেখা হয় এবং কথাবার্তা হয়।(২৫) নরেনের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়ে যতীন মুখোপাধ্যায় একদম ভেঙ্গে পড়েন এবং যাদুগোপালকে বলেন, "আমার ডান হাতটা ভেঙ্গে গেছে"।(২৬) যতীন মুখোপাধ্যায় তখন এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি লালবাজার আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিলেন নরেনকে বার করে' আনার জন্য। তারপর তিনি ঠিক করেন যে, লালবাজার থেকে যখন নরেনকে পুলিশ আদালতে নিয়ে যাবে তখন সেই গাড়ী আক্রমণ করে' নরেনকে বার করে' নিয়ে আসবেন। এজন্য তিনি গোপেন রায়, সতীশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক লাডুলি মোহন মিত্র এবং আরও দুজনকে মজার পিস্তল দিয়ে লালবাজারের সামনে মোতায়েন করেন।(২৭) কিন্তু নরেন অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেদিন আর ওকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় না।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তখন যতীন মুখোপাধ্যায়কে বলেন যে, উত্তেজিত হয়ে ঐ ধরণের কাজ না করে' নরেনকে জামিনে খালাস করার বন্দো-বস্ত করা যাক। জামিন যাতে কোনরকমে নামঞ্জুর না হয় সেজন্য যতীন মুখোপাধ্যায় নিজেই তখন সরকারপক্ষের উকীল তারক সাধুর কাছে চলে যান। যতীন নিজেও তখন লুকিয়ে থাকছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নরেনকে জেল থেকে বার করবার জন্য সমস্ত ঝুঁকি নিয়েও সরকারপক্ষের

(২৫) —ঐ—।

(২৬) —ঐ—। মুজফ্ফর আহমদ তাঁর "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টী" বইটিতে ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর কথার উল্লেখ করে' বলেছেন যে, ডঃ সাহা তাঁকে বলেন, যতীন মুখোপাধ্যায় এম· এন· রায়কে তাঁর ডান হাত বলতেন।

(২৭) সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

উকীলের বাড়ী চলে যান তাঁর পরামর্শ এবং সাহায্যের জন্য। তারক সাধু যতীন মুখোপাধ্যায়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তারক সাধুই উপদেশ দেন যে, যদি যে ক'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একজনকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করানো যায় যে, সে এই ডাকাতিটি করেছে, তাহলে তিনি সরকারপক্ষের হয়ে নরেনকে জামিন দিতে আপত্তি করবেন না। যতীন মুখোপাধ্যায় তখন ফরিদপুর গ্রুপের নেতা পূর্ণ দাসকে নিজের হাতে একটি চিঠি লিখে পাঠান তার দলের কাউকে দিয়ে ঐরকম স্বীকারোক্তি করাবার জন্য। পূর্ণ দাস তাঁর দলের রাধাচরণ প্রামাণিককে জেলের মধ্যে বলে' পাঠান স্বীকারোক্তি করবার জন্য। রাধাচরণের স্বীকারোক্তির ফলে নরেনকে জামিন দেওয়া হয়। রাধাচরণের বয়স তখন ১৬ বছর। তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং জেলের মধ্যেই তিনি মারা যান।(২৮)

এক হাজার টাকার এবং দু'জনের ব্যক্তিগত জামিনে নরেনকে ২২শে ফেব্রুয়ারী ছেড়ে দেওয়া হয়। যে দু'জন মোক্তার জামিন হয়েছিলেন তাঁরা হলেন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এবং শশীভূষণ দাস। দল থেকে এ'দের জামিনের টাকা দিয়ে দেওয়া হয়।(২৯) জামিনে ছাড়া পেয়ে নরেন প্রথমেই জগদীশনাথ রায় লেনে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের ভাগ্নে জিতেন্দ্রকুমার বসুর কাছে পায়ে হেঁটে চলে যান। জিতেন্দ্রর কাছ থেকে ২০০ টাকা ধারে করে' নরেন তারক প্রামাণিক লেনে তাঁর বোন পান্নাময়ীর বাড়ী যান এবং সেখান থেকেই সন্ধ্যার পর আত্মগোপন করেন।(৩০)

(২৮) ফরিদপুর গ্রুপের অন্যতম নেতা কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও এটি সত্য বলে' আমায় জানান। কালীপ্রসাদবাবু আমাকে বলেন যে, এম· এন· রায় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যখন কলকাতায় আসেন, তখন কালীপ্রসাদবাবু ওঁর সঙ্গে দেখা করেন। রায় প্রথমেই ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন "সেই ছেলেটির কি খবর?" যখন শুনলেন যে জেলের মধ্যেই সে পাগল হয়ে মারা যায়, তখন রায় কয়েক মিনিট চুপ হয়ে যান এবং তাঁর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে।

(২৯) কালীচরণ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

(৩০) ডাঃ অশ্বিনী রায় বলেন যে তিনি নরেনের সঙ্গে ছিলেন। পান্নাময়ীর বাড়ী থেকে বেরোবার সময় গোয়েন্দা পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য নরেন ডাঃ অশ্বিনী রায়ের সঙ্গে তার শালটি বদল করে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যায়, অশ্বিনী রায় পরে নরেনের লাল রং-এর শালটি গায়ে দিয়ে সামনে দিয়ে বেরোন। দু'জন গোয়েন্দা পুলিশ ওঁকে নরেন ভেবে ওঁর পিছন পিছন হাঁটতে থাকে। অশ্বিনী রায় নরেনের সেই লাল রং-এর শালটি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।

যতীন মুখোপাধ্যায়ের আদেশে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখোপাধ্যায়কে ২৮শে ফেব্রুয়ারী কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর হেদুয়ার অপর দিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।(৩১)

ইতিমধ্যে রাসবিহারী বসু অভ্যুত্থানের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ধার্য করেন, কারণ তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, খবরটি পুলিশকে জানানো হয়েছে। ১৯শে ফেব্রুয়ারীও অভ্যুত্থান সম্ভব হয় নি, কারণ কৃপাল সিং নামে একজন রাসবিহারীর দলে ঢুকে পড়েছিল এবং সে পরিকল্পনাটি পুলিসকে জানিয়ে দেয়। রাসবিহারী তাকে বিশ্বাস করেছিলেন এই জন্য যে, সে নিজেকে গদর পার্টীর লোক বলে পরিচয় দেয় এবং বলে যে সাংহাই থেকে এসেছে। এইভাবেই সারা ভারত অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাটি সেই সময় বানচাল হয়ে যায়।(৩২)

এই পরিকল্পনা বানচাল হবার পর লাহোরে তেরজন বিপ্লবীকে অস্ত্র-শস্ত্র, প্রচারপত্র এবং চারটি দলীয় পতাকা সহ গ্রেপ্তার করা হয়।(৩৩) কৃপাল সিং-এর চেষ্টা সত্ত্বেও তার চোখে ধুলো দিয়ে রাসবিহারী এবং পিংলে পালাতে সক্ষম হন। কর্তার সিং এবং আর যাঁরা ধরা পড়েন তাঁরা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'ন; কর্তার সিং-এর ফাঁসি হয়।

রাসবিহারী আবার বেনারসে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে বাংলায়। ১২ই মে ১৯১৫ সালে রাসবিহারী পি· এন· টেগোর নাম নিয়ে জাপান চলে যান।(৩৪) পিংলে অবশ্য সৈন্যদের মধ্যে তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন; তবে তিনিও ২৩শে মার্চ ধরা পড়েন। ঐদিন ১২তম ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্যদের আড্ডায় (the lines of the 12th Indian Cavalry) দশটি বোমা সহ একটি টিনের বাক্স হাতে তিনি ধরা পড়েন। তাঁর সহযোগী হিসাবে কয়েকজন ভারতীয় সৈন্যও একই সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়। পিংলের ফাঁসি হয়।

(৩১) জিতেন্দ্রকুমার বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(৩২) বিমানবিহারী মজুমদার—Militant Nationalism in India—পৃঃ ১৬৯।
(৩৩) —ঐ—পৃঃ ১৬৯।
(৩৪) ডাঃ যাদুগোপাল, পৃঃ ৩৮৭।

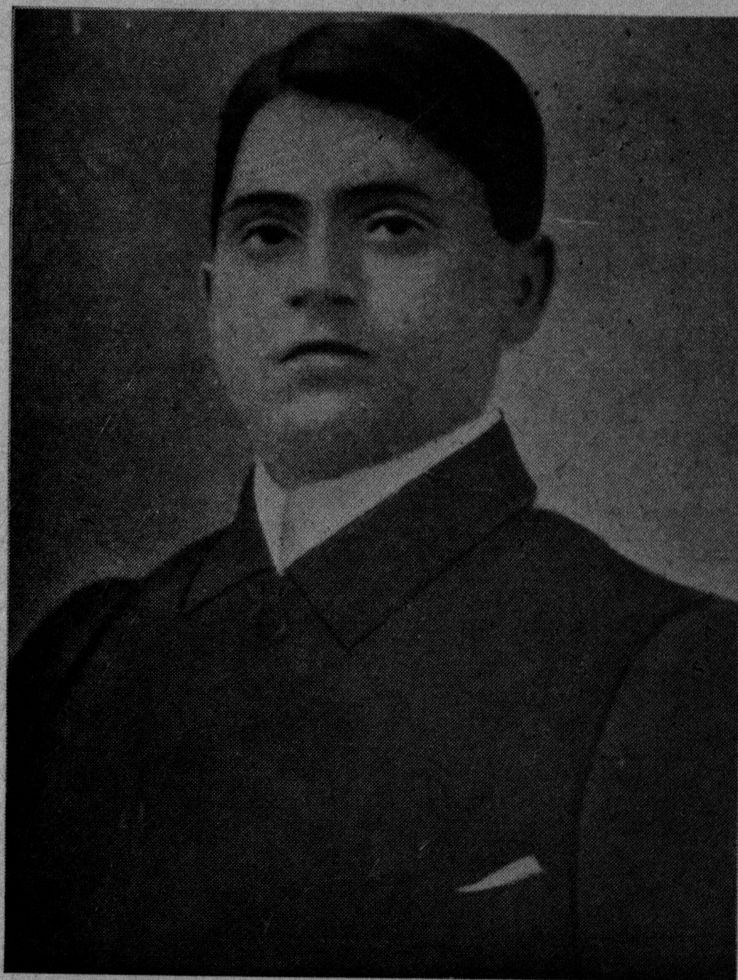
আট : বালেশ্বর থেকে ব্যাটাভিয়া

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটের বাড়ীতে একটি ঘরে যতীন মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে মিলে যখন একটি গোপন সভা করছিলেন, সেই সময়ে পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর নীরদ হালদার হঠাৎ সেই ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেসা করলেন নরেনবাবু এখানে আছেন কিনা? নীরদ সেই ঘরের মধ্যে যতীন মুখার্জীকে দেখে চিৎকার করে' উঠলেন, 'আরে, যতীনবাবু যে; আপনি এখানে কি করছেন?' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নীরদ হালদারকে গুলিবিদ্ধ করে মারা হয়, আর গুপ্ত দলটিও তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে' হরীতকী বাগান লেনের গোপন ঘাঁটিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সকলেই অনুভব করলেন, যতীন মুখার্জীর পক্ষে কলকাতা আর নিরাপদ জায়গা নয়। নরেন তখন যতীন মুখার্জীর জন্য একটি গোপন স্থান খুঁজে বার করবার জন্য মোহনদিয়া গ্রামে চলে গেলেন, বালেশ্বর থেকে প্রায় ২০ মাইল দূরে। নলিনী কর একসময় ঐ গ্রামের একটি জায়গায় লুকিয়ে থাকতেন; তিনিও নরেনের সঙ্গে গেলেন সেই জায়গাটি দেখিয়ে দেবার জন্য। জায়গাটি নরেনের মনোমত হ'ল। তখন ফরিদপুর দল থেকে তিনজন সশস্ত্র প্রহরী এবং নলিনী করকে সঙ্গে দিয়ে যতীন মুখার্জীকে সেই গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।(১) বালেশ্বরে খোলা হলো একটি দোকান, শৈলেশ্বর বসুর তত্ত্বাবধানে।

বালেশ্বরের এই দোকান, 'দি ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ম' কলকাতা এবং যতীন মুখার্জীর সঙ্গে সংযোগরক্ষার কাজ করতে লাগলো; আর নলিনী কর যোগাযোগ রাখতে লাগলেন কলকাতা ও যতীন মুখার্জীর গোপন ঘাঁটির সঙ্গে।

যতীন মুখার্জী মোহনদিয়াতে স্থানান্তরিত হবার কিছুদিন পর ১৯১৫

(১) নলিনী করের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।



যতীন মুখার্জী

সালের মার্চ মাসে জার্মানী থেকে জিতেন লাহিড়ী বাংলার বিপ্লবীদের জন্য খবর আনলেন, আমেরিকা থেকে দুই জাহাজ ভর্তি অস্ত্র-গোলা-বারুদ আসছে। আমেরিকাবাসী জার্মানদের সহায়তায় হেরম্ব গুপ্তও জর্জ পল বোয়েম (George Paul Boehm) নামে মিলিটারী ট্রেনিং প্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে: উদ্দেশ্য, বার্মাবাসী ভারতীয়দের মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়া, যাতে তারা ভারতীয় আর্মি ও পুলিশের সহযোগিতায় বার্মাকে স্বাধীন করতে পারে। বার্মা তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ ছিল। সেই শিক্ষাপ্রাপ্ত সশস্ত্র ব্যক্তিরা বার্মাকে স্বাধীন করার পর বার্মা ও শ্যামদেশের ভারতীয়দের সহযোগিতায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করবে, এরূপ পরিকল্পনাও ছিল।(২) এছাড়া আরও পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, গদর পার্টির সভ্যরা (Ghadr Party) পাঞ্জাবের গ্রামে এবং ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করবে।(৩)

এই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য জার্মানরা বাংলার বিপ্লবীদের জানালো, তাদের একজন প্রতিনিধিকে ব্যাটাভিয়াতে পাঠাতে। তদনুসারে নরেন 'হ্যারি এন্ড সন্স' (Harry and Sons)-এর এজেন্ট সেজে সি· মার্টিন (C. Martin) এই ছদ্মনাম ধরে ১৯১৫-র এপ্রিলে ব্যাটাভিয়াতে গেলেন।(৪) হ্যারি এন্ড সন্স-এর ৪১, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলকাতার অফিসের সঙ্গে ব্যাটাভিয়ার যোগাযোগ রইলো। এই কোম্পানী নরেন ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গেও সংযোগরক্ষা করতে লাগলো;(৫) হ্যারি এন্ড সন্স থেকে বিপ্লবীরা নির্দেশও পেতে লাগলো এবং এই কোম্পানীর মাধ্যমে তাদের খবরাখবরও জানাতে লাগলো।(৬)

মার্টিন (নরেন) ব্যাটাভিয়া পৌছনোর পর জার্মান কনসাল জেনারেল জাভার এক বড় জার্মান ব্যবসায়ী থিয়োডোর হেলফেরিখের (Theodre Helfferich) সঙ্গে মার্টিনের পরিচয় করিয়ে দেয়।(৭) হেলফেরিক তাকে বলে, ভারতীয়দের বিপ্লবে সহায়তা করার জন্য এক জাহাজ ভর্তি অস্ত্র-গোলা-

(২) ডাঃ যাদুগোপাল: পৃঃ ৩৩।
(৩) —ঐ— পৃঃ ৩৪।
(৪) হরিকুমার চক্রবর্তী ঐ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী ছিলেন; মালিক হরিদাস ভট্টাচার্য বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য তাঁর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনিও চাংড়িপোতার অধিবাসী ছিলেন।
(৫) ডাঃ যাদুগোপাল: পৃঃ ৩৮৯।
(৬) ডাঃ অশ্বিনীলাল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(৭) থিয়োডোরে হেলফেরিখ (Theodore Helfferich) ব্যাটাভিয়ার জার্মান

বারুদ করাচীর দিকে রওনা হয়ে গেছে। মার্টিন তখন বলেন জাহাজটিকে বাংলার দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য। তখন সাংহাইয়ের জার্মান কনসাল জেনা-রেলকে ব্যাপারটি জানিয়ে সেইমত ব্যবস্থা করা হয়। মার্টিন তখন "ব্যবসা সন্তোষজনক হয়েছে" এই কথা জানিয়ে কলকাতার হ্যারি এন্ড সন্সকে টেলি-গ্রাম করেন। জুন মাসে মার্টিনকে হ্যারি এন্ড সন্স টাকার জন্য তার পাঠায়, এবং তারপর থেকে ব্যাটাভিয়ার হেলফেরিক কলকাতার হ্যারি এন্ড সন্সকে দফায় দফায় টাকা পাঠাতে থাকেন। সিডিশান কমিটির রিপোর্ট (Sedition Committee Report) অনুযায়ী ঐ টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪৩,০০০ টাকা এবং তৎকালীন সরকার ঐ ষড়যন্ত্র ধরে ফেলার আগেই বিপ্লবীরা ঐ টাকা থেকে প্রায় ৩৩,০০০ টাকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যে জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র আসছিলো তার নাম ছিল ম্যাভেরিক (S. S. Maverick)। দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের রায়মঙ্গলে জাহাজ আসবার কথা। জুন মাসের মাঝামাঝি মার্টিন চলে এলেন ভারতে, জাহাজ থেকে মাল খালাস করে' তার বিলি বন্দোবস্ত করবার জন্য। জাহাজের মালের মধ্যে ছিল ৩০,০০০ রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪০০ রাউন্ড গুলি, এবং নগদ টাকা দু' লক্ষ।

ব্যাটাভিয়া থেকে ফিরে নরেন সোজা চলে গেলেন মোহনদিয়ায় যতীন মুখার্জীর সঙ্গে পরামর্শ করতে কীভাবে ম্যাভেরিক জাহাজ থেকে মালখালাস করা হবে এবং সেই অস্ত্রশস্ত্রের সদ্ব্যবহার করা যাবে। এই বিষয়ে পরি-কল্পনা স্থির করার জন্য অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গেও নরেন পরামর্শ করেছিলেন।

সকলে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্রকে তিনভাগে ভাগ করে' বন্টন করা হবেঃ (এক) হাতিয়ার জন্য,—এটা ছিল বরিশাল দলের দায়িত্বে, যাদের ওপর পূর্ববঙ্গের জেলাগুলির ভার ছিল। অস্ত্র বন্টনের ব্যাপারে নরেন ঘোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত এবং আরও কয়েকজনকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। (দুই) কলকাতার জন্য;—এই বিষয়ে দায়িত্ব ছিল নরেন ভট্টাচার্য এবং বিপিন গাঙ্গুলীর উপর। তারা কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মের

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বেন মায়েরস্ কোম্পানীর (Ben Mayers Company) ম্যানেজার ছিলেন। থিয়োডোর এবং তাঁর ভাই এনভিল (Envil) একত্রে জার্মান কনসালের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে কাজ করতেন এবং থিয়োডোর ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রের ব্যাটাভিয়া কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন।

সৈন্যদের কাছ থেকে সহায়তার নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছিলেন এবং কলকাতা দখলের পূর্বেই বন্দুকের দোকানগুলি লুট করে' নেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দরকার হলে কোন ব্রীজ বা অট্টালিকা বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ফণী চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার ও ব্রজেন দত্তর উপর। (তিন) বালেশ্বরঃ যতীন মুখার্জী নিজে থাকবেন বালেশ্বরের দায়িত্বে।(৮)

বিপ্লবীরা তাদের বিদ্রোহের আঁক কষেছিলেন নরেনের এই যুক্তিতে যে, বৃটিশ সরকার তার সেনাবলের অধিকাংশকে ভারতের বাইরে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হবে। প্রকৃতপক্ষে, ইংল্যান্ড থেকে কিছু অদক্ষ পদাতিক সৈন্যদল আসার আগে, ভারতে অবস্থিত বৃটিশ দুর্গসৈন্যের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫,০০০ হাজারের নীচে।(৯) প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ভারত সরকার ৮০,০০০ বৃটিশ অফিসার ও সৈন্য, ২১০,০০০ ভারতীয় অফিসার ও কর্মচারী, ৭০ মিলিয়ন রাউন্ড ক্ষুদ্রাকার অস্ত্রশস্ত্র, ৬০,০০০ রাইফেল এবং অত্যাধুনিক ধরণের ৫৫০ কামান ভারতের বাইরে যুদ্ধের প্রয়োজনে পাঠিয়ে দিয়েছিল।(১০)

বিপ্লবীরা সেই কারণেই যুক্তিযুক্তভাবে ভেবেছিলেন যে, বাংলার সৈন্যদলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সংখ্যাগতভাবে তাঁরা যথেষ্ট শক্তিশালী, যদিও তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন যে, সরকার বাংলার বাইরে থেকে অতিরিক্ত সৈন্যদল আমদানী করবে। সেইজন্য তাঁরা বাংলার সঙ্গে যুক্ত তিনটি প্রধান রেলওয়ের সমস্ত ব্রীজগুলিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। যতীন মুখার্জীর উপর বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেলওয়েকে রোখবার দায়িত্ব পড়ে; বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের দায়িত্ব পড়ে ভোলানাথ চ্যাটার্জীর উপর; আর সতীশ চক্রবর্তীর দায়িত্ব পড়ে বর্ধমানে অজয় নদের উপর ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের ব্রীজ উড়িয়ে দেবার।(১১) নরেন ঘোষ চৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তীকে হাতিয়া যাবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয় সেখানে একটি

(৮) ডাঃ যাদুগোপালঃ পৃঃ ৩৫।

(৯) লর্ড হার্ডিঞ্জঃ আমার ভারতীয় দিনগুলি (My Indian Years) পৃঃ ১০২-১০৩।

(১০) বি. বি. মজুমদারঃ ভারতের জঙ্গী জাতীয়তাবাদ (Militant Nationalism in India) পৃঃ ১৫৭-৫৮।

(১১) সতীশ চক্রবর্তী এই পুস্তকের লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের সময় অজয় নদের উপর ব্রীজ উড়িয়ে দেবার কোন পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করেন। তিনি মনে করেন সিডিশন কমিটির রিপোর্ট (Sedition Committee

সশস্ত্রবাহিনী সংগঠন করে' পূর্ব বাংলার জেলাগুলির দখল নিতে, তারপর কলকাতা অভিমুখে সসৈন্য যাত্রা করতে। নরেন ও বিপিন গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে কলকাতার বিপ্লবী দল সব প্রথমে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের অধিকারে আনবেন, তারপর ফোর্ট উইলিয়ম,(১২) এবং সর্বশেষে কলকাতা শহর দখল করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, ফেব্রুয়ারীর (২১/১৯) তারিখ ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর সরকারকে নানা সংবাদের দ্বারা সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছিলো যে, বিপ্লবীরা জার্মান অস্ত্রের সহায়তায় বাংলায় অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছে(১৩) এবং সরকারও সেইমত ব্যবস্থা নিচ্ছিলেন।

ম্যাভেরিক জাহাজের বরাত

এস. এস. ম্যাভেরিক (S. S. Maverick) একটি তৈলবাহী জাহাজ এবং সান ফ্রান্সিসকোর একটি জার্মান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এফ. জেবসেন অ্যান্ড কোম্পানী এর মালিক ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিলের কাছাকাছি সময়ে লস এঞ্জেলেসের নিকটবর্তী স্যান পেড্রো (San Pedro) বন্দর থেকে জাহাজটি যাত্রা করে। জাহাজটি প্রথমে ক্যালিফোর্ণিয়ার দক্ষিণ প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত স্যান জোস দেল ক্যালিও (San Jos del Caleo)-তে যায় এবং সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে জাভায় যাবার জন্য একটি নতুন অবাধ ছাড়পত্র যোগাড় করে।

জাহাজটি তারপর সোকোরো (Socorro) দ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করে। এই নির্জন দ্বীপটি মেক্সিকোর উপকূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে; সেখানে অ্যানি লারসেন (Annie Larsen) নামে একটি দ্বি-মাস্তুল জাহাজ (Schooner)-এর সংগে যোগাযোগ করার কথা ছিল। দ্বি-মাস্তুল জাহাজটির মেক্সিকোর অন্তর্বর্তী একাপুলকো (Acapulca) থেকে অস্ত্র বোঝাই হয়ে

Report) যেখান থেকে এই সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে তা আংশিক সত্য। তিনি আরও বলেন, উক্ত রিপোর্টে যতীন মুখার্জী সম্বন্ধে পরিবেশিত তথ্য সম্পূর্ণ অসত্য। কেবল ভোলানাথ চ্যাটার্জীকে নির্দিষ্ট কাজ করতে ভার দেওয়া হয়েছিল, যদি প্রয়োজন হয়।

সিডিশন কমিটি রিপোর্টের এই অংশটির প্রায় পুরোটাই ফণী চক্রবর্তীর কাছ থেকে যে স্বীকৃতি তাঁকে অত্যাচার করে আদায় করা হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা—লেখক।

(১২) সিডিশন কমিটি রিপোর্ট: পৃ: ৮৩।

(১৩) লর্ড হার্ডিঞ্জ: My Indian Years: পৃ: ১১৮।

এসে ম্যাভেরিক জাহাজে মালখালাস করে দেওয়ার কথা হয়েছিল। জাহাজে অস্ত্র-গোলাবারুদ রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, রাইফেলগুলি তেলের ট্যাঙ্কে গাদা করে তেলে চুবিয়ে রাখা হবে, আর গোলাবারুদ থাকবে অন্য একটি খালি ট্যাঙ্কে; বিপদ বুঝলে সেই ট্যাঙ্কেও তেল ভর্তি করা হবে।(১৪)

ম্যাভেরিক জাহাজ সেই দ্বীপে পেঁছানোর পর ক্যাপ্টেন সেখানে অ্যানি লারসেনের চারজন লোককে দেখতে পান। তাদের কাছে তিনি জানতে পারলেন যে, অ্যানি লারসেন জাহাজটি সেই দ্বীপে এসেছিল কিন্তু পানীয় জল ও রসদের অভাবে মেক্সিকো উপকূলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। ম্যাভেরিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের জন্য অ্যানি লারসেন একটি খবর রেখে গেছে, যে পর্যন্ত না সে আবার ফিরে আসে ক্যাপ্টেন যেন তার জন্য অপেক্ষা করেন।

কিন্তু অ্যানি লারসেন আর ফিরে আসে নি। ২৯ দিন তার জন্য অপেক্ষা করার পর ম্যাভেরিকের ক্যাপ্টেন ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান দিয়েগোর (San Diego) দিকে রওনা হতে মনস্থ করলেন। স্যান দিয়েগোতে তিনি তাঁর জাহাজের জার্মান মালিকের কাছ থেকে নির্দেশ পেলেন, হাওয়াই (Hawaii) দ্বীপের হিলো (Hilo) বন্দরের দিকে অগ্রসর হতে পরবর্তী নির্দেশের জন্য। ম্যাভেরিক ১৪ জুনের কাছাকাছি সময়ে হিলো বন্দরে উপস্থিত হয় এবং সেখানে সে অন্য একটি জার্মান জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে নির্দেশ পায় জনস্টন দ্বীপের (Johnston island) দিকে অগ্রসর হতে, যে দ্বীপটি হাওয়াই থেকে অনেকটা দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত, এবং সেখানে অ্যানি লারসেনের জন্য অপেক্ষা করতে। ম্যাভেরিক যখন সেখানে পেঁছলো, তখন স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থা প্রেস তার যুদ্ধ বুলেটিনে (War Bulletin) সমস্ত পরিকল্পনাটি ফাঁস করে দেয়। এরকম ঘটার কারণ খুব সম্ভবতঃ জাহাজের নাবিকেরা যারা গদর পার্টির লোক ছিল তারা বড় বেশী অস্ত্রের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতো এবং তার ফলেই সমস্ত পরিকল্পনাটি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকবে।(১৫)

জনস্টন দ্বীপে ম্যাভেরিক উপস্থিত হয়ে অ্যানি লারসেনের জন্য অপেক্ষা

(১৪) সিডিশন কমিটি রিপোর্ট, পৃঃ ১২৩-২৪।

(১৫) বি. বি. মজুমদারের মতানুসারে ম্যাভেরিক ও এ্যানি লারসেন জাহাজের খবর শ্যামদেশে বিপ্লবীদের প্রতিনিধি উকীল কুমুদনাথ মুখার্জীর কথাবার্তা থেকে ফাঁস হয়ে যায়। (Militant Nationalism in India: পৃঃ ১৭২)।

করতে লাগলো। কিন্তু একপক্ষকাল অপেক্ষা করার পর যখন তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আশা আর রইলো না তখন ম্যাভেরিক জাভার দিকে যাত্রা করার নির্দেশ পেল। আর সম্ভবতঃ এইখানেই ঐ জাহাজে অস্ত্রসংগ্রহের সমস্ত পরিকল্পনাটিও পরিত্যক্ত হয়।(১৬)

সোকোরো দ্বীপে ম্যাভেরিক পেঁছিনোর পর দু'খানা রাজকীয় জাহাজ কেণ্ট ও রেনবো (H. M. S. Kent ; H. M. S. Rainbow) সেখানে উপস্থিত হয়ে ম্যাভেরিক জাহাজ খানাতল্লাশ করার জন্য সার্চ পার্টি পাঠায়। রাজকীয় জাহাজ কেণ্ট যখন সেখানে প্রথম এল, পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট গদর পার্টির কর্মীদের নেতা হরি সিং তখন নিজেদের পারসী বলে পরিচয় দেন, নিজের নাম বলেন 'জাহাঙ্গীর', আর তাঁর পার্টির সমস্ত পত্র-পুস্তিকা ইঞ্জিন ঘরে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলে সমুদ্রের জলে ফেলে দেন। ম্যাভেরিক জাভায় পেঁছিলে পর ডাচ সরকারও সেই জাহাজে খানাতল্লাশ করে কিন্তু কিছু পায় না। সিঙ্গাপুরের একটি সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী জাহাজে যত অস্ত্র ছিল এবং গদর পার্টির সমস্ত কাগজপত্র সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করা হয়।

ব্যাটাভিয়াতে হেল্‌ফেরিখ (Helfferich) ম্যাভেরিক জাহাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো; পরে মার্টিন যখন আমেরিকা গেল, সে ওই জাহাজেই হরি সিং-এর জায়গায় চড়েছিল।

অস্ত্র প্রেরণের আর একটি প্রচেষ্টা

অস্ত্র প্রেরণের আর একটি চেষ্টা হয়েছিল হেনরী জাহাজ (Henry S.) মারফৎ; এটি ছিল দ্বি-মাস্তুল জাহাজ (Schooner) এবং এর সঙ্গে ছিল সহায়কারী অতিরিক্ত নাবিকদল। সম্ভবতঃ ১৯১৫-র ১৪ই জুলাই জাহাজটি বোর্ণিওর পশ্চিম উপকূলবর্তী পোনটিয়ানক (Pontianak) বন্দরের উদ্দেশ্যে ম্যানিলা বন্দর ত্যাগ করে। হেনরী জাহাজ সাংহাইতে যাবে বলে প্রথমে এর ছাড়পত্র তৈরী হয়েছিল, এবং অস্ত্র-গোলাবারুদের একটি চালানও ছিল এই জাহাজে। কিন্তু কাস্টমস্-এর কর্তাব্যক্তিরা সেই অস্ত্রের চালানটি ধরে ফেলে, আর জাহাজটি ম্যানিলা ছাড়বার আগেই সেগুলিকে জাহাজ থেকে নামিয়ে রেখে যেতে বাধ্য হয়।

হেনরী জাহাজে আমেরিকান নাগরিকবেশে জার্মান নাগরিক জর্জ পল বোয়েম (George Paul Boehm) ব্যাটাভিয়া থেকে সাংহাই যাবার পথে

সিঙ্গাপুরে ধরা পড়েন ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে। শিকাগোতে বাংলার বিপ্লবীদলের প্রতিনিধি হেরম্বলাল গুপ্তের সঙ্গে বোয়েম (Boehm) পরিচিত হ'ন মার্চ মাসে। গুপ্ত তাকে বলেন, ভারতবর্ষে বিদ্রোহের সময় আসন্ন এবং ভারতের উদ্দেশে মেক্সিকো থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একটি জাহাজ রওনা হয়েছে। গুপ্ত তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বার্মার ভারতীয়দের অস্ত্রশিক্ষা দিতে পারবেন কিনা। বোয়েম (Boehm) ১৫০০ ডলারের বিনিময়ে ব্যাঙ্কক হয়ে বর্মা সীমান্তে যেতে রাজী হ'ন অস্ত্রশিক্ষাদানের জন্য। ইতিমধ্যে বোয়েমের (Boehm) সঙ্গে যোধ সিং (Jodh Singh) এবং স্টারনেক (Sterneck) নামে এক ডাচ আমেরিকান নাগরিকের সাক্ষাৎ হয়। জার্মান কনসুলেট থেকে নির্ধারিত টাকা পেয়ে (Boehm) স্টারনেক-কে (Sterneck) সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্ককের পথে যাত্রা করেন। ১৯১৫-র জুনে ম্যানিলায় পেঁছে সেখানকার জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি বিস্মিত হ'ন যে, কনসাল ঐ-ধরণের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু জানেন না। জার্মান কনসালকে ঐ পরিকল্পনা সম্পর্কে যে চিঠি লেখা হয়েছিল তাও লোপাট হয়ে গিয়েছিল।(১৭) সেই চিঠিখানা মাঝপথে ফরাসী কর্তৃপক্ষ আটকে দিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়।

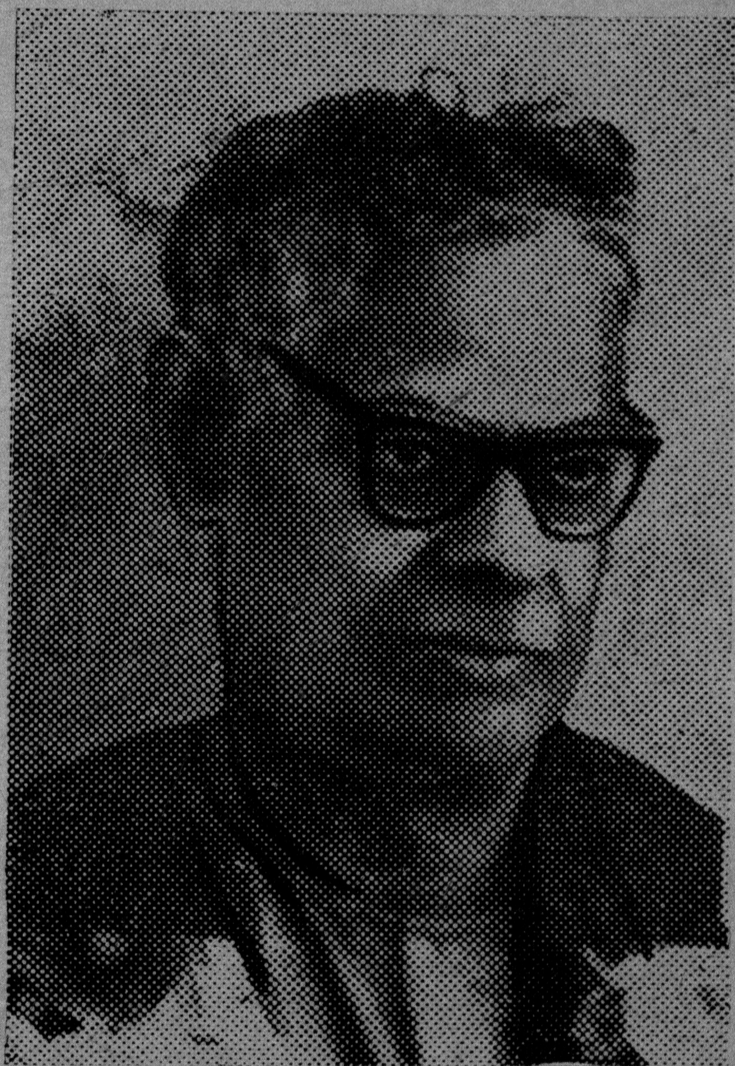
ঘটনা যাই হোক, জার্মান কনসাল বোয়েমকে (Boehm) নির্দেশ দেন জাহাজে মজুদ ৫,০০০ রিভলভার থেকে ৫০০ রিভলভার ব্যাঙ্ককে নামিয়ে দিতে এবং বাকীটা নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হ'তে। এগুলি ছিল মজার পিস্তল।(১৮) কিন্তু পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে সংযোগ ব্যবস্থা এতই দুর্বল ছিল যে, গোটা পরিকল্পনাই যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতার জন্য বানচাল হয়ে যায়।

নয়ঃ ব্যাটাভিয়া যাতায়াত

নরেন ব্যাটাভিয়া যাত্রার প্রাক্‌কালে দক্ষিণ কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে দু'টি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেঃ একটি, সিগনালিং ও টেলিগ্রাফি শিক্ষার জন্য; অপরটি গেরিলা যুদ্ধের টেক্‌নিক্‌ শেখানোর জন্য।(১) এই কাজে শিক্ষিত করে তোলার জন্য অনেক ভলান্‌টিয়ার সংগ্রহ করা হয় এবং ট্রেনিং সেন্টারটি এমন গোপনে পরিচালিত হয়েছিল যে, পুলিস কোনদিনই এর কোন সন্ধানই পায় নি, এমনকি সিডিশান কমিটি রিপোর্টেও (Sedition Committee Report) এ' সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। ট্রেনিংয়ের জন্য প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক সর্বক্ষণের জন্য সেই সেন্টারে থাকতেন এবং ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্ব ছিল পাঁচুগোপাল ব্যানার্জী ওরফে পাঁচকড়ি ব্যানার্জীর উপর। গঙ্গার ওপার থেকে হাওড়া থেকে ফেরী সার্ভিসের মাধ্যমে এই ট্রেণিং সেন্টারগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা হতো।(২)

উত্তর কলকাতার হরিতকী বাগান লেনের নিজস্ব গোপন ঘাঁটিতেই নরেন বেশীর ভাগ সময় থাকতেন এবং দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে আর একটি যে গোপন ঘাঁটি ছিল, সেখানেও মাঝে মধ্যে থাকতেন। এই দু'টি গোপন ঘাঁটির কথা কেবলমাত্র ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী ও অতুলকৃষ্ণ ঘোষ জানতেন।(৩) একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর নরেন সেই ট্রেণিং সেন্টারগুলিতে যেতেন, আর বালেশ্বরের কাছে মোহনদিয়াতে যতীন মুখার্জীর জন্য যে গোপন আস্তানা ছিল সেখানেও যেতেন যতীনদার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য। গঙ্গার ওপারে নৌকা করে গিয়ে ছোট স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়তেন। ব্যাটাভিয়া যাবার আগে নরেন মোহনদিয়াতে যান এবং যতীন মুখার্জীর সঙ্গে সমস্ত পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করেন।

(১) নলিনী কর ও সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(২) নলিনী কর ও সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(৩) নলিনী করের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। এ সম্পর্কে পরিশিষ্টে মুদ্রিত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেও উল্লিখিত আছে।



হরিকুমার চক্রবর্তী

১৯১৫-র এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ থেকে একটি জাহাজে চড়ে নরেন ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন। ব্যাটাভিয়া পেঁছে তিনি হেলফেরিখ ভ্রাতৃদ্বয় এবং জার্মান কনসালের সঙ্গে দেখা করেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে ভারতে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থাও করেন। তিনি সি· এ· মার্টিন এই ছদ্মনামে কলকাতার হ্যারি এন্ড সন্স-কে একটি টেলিগ্রাম পাঠান এবং ব্যাটাভিয়ায় তাঁর দলের লোকদের কলকাতার সঙ্গে ভবিষ্যতে সংযোগরক্ষার জন্য হ্যারি এন্ড সন্স এবং অন্যান্য আরও দু'একটি ঠিকানাসহ শ্রমজীবী সমবায়ের ঠিকানাও দেন। কেবলমাত্র নরেনের সঙ্গে খবরাখবর করার জন্যই অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রমজীবী সমবায়ের ঠিকানা ব্যবহার করা হতো।(৪) অস্ত্রের ব্যাপারে চুক্তি সমাপ্ত করে নরেন ভারতে ফিরে আসেন মেগাপট্টম বন্দরে ১৪ই জুন। পরের দিন তিনি মাদ্রাজে চলে যান। সেখানে তিনি ব্যাটাভিয়া থেকে আনা সি· এ· মার্টিনের নামে একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট একটি ব্যাঙ্কে ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু যেহেতু ব্যাঙ্ক সেই চেক সম্পর্কে ব্যাটাভিয়া থেকে কোন নির্দেশ পায় নি সেই জন্য ব্যাঙ্ক টাকা দিতে অস্বীকার করে। পরে কলকাতায় অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই ড্রাফটিকে ক্যাশ করেন। জাভা থেকে প্রেরিত জার্মান টাকা বিপ্লবীদের কাছে পেঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন ব্যাটাভিয়ার অধিবাসী আব্দুল সালাম নামে একজন কাশ্মীরী মুসলমান। দূর প্রাচ্যের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বাণিজ্যকারী ছোটি-রমল এণ্ড কোম্পানী নামে একটি সিন্ধি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। আব্দুল সালাম এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ সরকারের আদেশে তিনি অন্তরিত হন।(৫)

মাদ্রাজে পেঁছে মার্টিন কলকাতাতে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীকে একটি টেলিগ্রাম করেন, "এখানে পেঁছেছি. আজ রাতে বালেশ্বর রওনা হচ্ছি সেখানে কারো সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশায়।" এরকম একটা টেলিগ্রাম করা হয়েছে, এ খবর পুলিস অনেক পরে জানতে পারে এবং বালেশ্বরে খোঁজখবর করে, যার শেষ পরিণতি হল মোহনদিয়ার গুপ্ত ঘাঁটি আবিষ্কার এবং কাপ্তি-পোদাতে পুলিসের সঙ্গে যতীন মুখার্জীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও মৃত্যু-বরণ।

বালেশ্বরে গিয়ে যতীন মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর গোপন আস্তানায় দেখা করে

(৪) ডাঃ অশ্বিনীলাল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।
(৫) জেমস্ ক্যাম্বেল কার, পলিকাল ট্রাব্‌ল্ ইন ইণ্ডিয়া, (১৯০৭—১৯১৭) —পৃঃ ২৭৮।

নরেন কলকাতায় যান এবং যোগাযোগ করেন ব্যাটাভিয়া থেকে আগত কুমুদ-নাথ মুখাজীর সঙ্গে যিনি কিছু সংবাদ নিয়ে এসেছিলেন ব্যাটাভিয়া থেকে।

কুমুদনাথ মুখাজী এক বঙ্গসন্তান যিনি ১৯১২-র মার্চ থেকে ব্যাঙ্ককে বাস করছিলেন এবং সেখানে ওকালতী করতেন। ১৯১৪-র এপ্রিলে তিনি ভোলানাথ চ্যাটার্জীর সংস্পর্শে আসেন এবং জানতে পারেন যে, ভোলানাথ বাংলার বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। প্রথম মহাযুদ্ধ লাগার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভোলানাথ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং জার্মান পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করবার জন্য তিনি কলকাতার বিপ্লবীদের জানান যে, ব্যাঙ্ককের কুমুদনাথ মুখাজী তাঁদের অন্যতম সমর্থক। তদনুসারে ১৯১৫-র জুন মাসে ব্যাঙ্ককের গদর পার্টির সভ্যরা কুমুদনাথকে কিছু টাকা ও সংবাদ নিয়ে কলকাতায় যেতে বলেন; তখন ব্যাঙ্ককের শিবদয়াল কাপুর যে টাকা দেন সেই টাকা নিয়ে কুমুদনাথ ১৮ই জুন ব্যাঙ্কক ত্যাগ করেন। কলকাতায় পেৌছান ৩রা জুলাই এবং যেমন নির্দেশ পেয়েছিলেন সেই অনুসারে ডাঃ যাদুগোপাল মুখাজীর সঙ্গে দেখা করতে যান। ডাঃ যাদুগোপালের বাড়ীতে ভোলানাথকেও তিনি দেখতে পান। কলকাতায় ভোলানাথ কুমুদনাথ মুখাজীর সঙ্গে নরেনের পরিচয় করিয়ে দেন "তাঁদের নেতা" হিসাবে,(৬) কিন্তু নরেনের নামটা চেপে যান। নরেন কুমুদনাথকে ব্যাটাভিয়াতে ফিরে যেতে বলেন এবং হেলফেরিখকে এই সংবাদ জানাতে বলেন কেমনভাবে উপযুক্ত ট্রেনিংপ্রাপ্ত বিপ্লবীরা জার্মান সহায়তা ও রাইফেলের অভাবে ক্রমাগত নানা অসুবিধা ভোগ করছেন। তদনুযায়ী কুমুদনাথ ২৪শে জুলাই মাদ্রাজ হয়ে ভারত ত্যাগ করেন।

এদিকে, একপক্ষকালের বেশী সময় সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে অপেক্ষা করে ডাঃ অশ্বিনী রায় এবং সাতকড়ি ব্যানার্জী কলকাতায় ফিরে এসে হ্যারি এন্ড সন্স-কে জানায় যে, তাঁরা কোন জাহাজের দেখা পান নি। তাঁদের বলা হয়েছিল যে, সমান্তরাল রেখায় জাহাজে তিনটি বিশিষ্ট ধরণের আলো থাকবে এবং জাহাজটি দেখা মাত্র তাঁরাও সেই প্রকার আলো ফেলে জাহাজকে সঙ্কেত দেবেন; তারপরে জাহাজ ঘাটে এলে মালগুলি নামিয়ে নেবেন। তাঁরা ক্রমান্বয়ে একটি গাছের আগায় উঠে পনের দিনের বেশী সময় অপেক্ষা করে মেয়াদী তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও(৭) যখন সেই জাহাজের দেখা পেলেন না তখনই তাঁরা ফিরে এলেন।

(৬) —ঐ—পৃঃ ২৮১।

(৭) ডাঃ অশ্বিনীলাল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

ইতিমধ্যে ম্যাভেরিক জাহাজে খানাতল্লাশ হয়, যার ফলে অস্ত্রপ্রেরণের সমস্ত ব্যবস্থাই ভেস্তে যায়। পেনাঙের সংবাদপত্রে জার্মান ষড়যন্ত্রের যে-খবর ফাঁস হয়ে যায় সেটি কুমুদনাথ মুখাজী কলকাতায় পাঠিয়ে দেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখাজীর কাছে; তিনি সেই খবরটি পাঠিয়ে দেন মোহনদিয়ায় যতীন মুখার্জীর কাছে। ব্যাটাভিয়ার সঙ্গে হ্যারি এণ্ড সন্সের যোগ আছে সন্দেহ করে পুলিস ৭ আগস্ট তারিখে ঐ অফিস সার্চ করে; এবং হরিকুমার চক্রবর্তী ও তাঁর ভাইকে গ্রেপ্তার করে। অফিসের সমস্ত কাগজপত্রও বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়।

ঐ সময়ে নরেন দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়া যাবার সঙ্কল্প করেন। যদিও নরেন বিপদের আশঙ্কা করছিলেন তথাপি তিনি আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে স্থলপথে অস্ত্র আনার বিষয়টি নিয়ে ডাঃ যাদুগোপাল মুখাজীর সঙ্গে কথা বলেন এবং ফণী চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে মোহনদিয়াতে যান। তিনি ফণী চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাটাভিয়া যেতে চেয়েছিলেন এবং সে ব্যাপারে যতীন মুখার্জীর অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। নরেন দু'তিন দিন মোহনদিয়ায় কাটিয়ে অগাস্ট মাসের শেষ দিকে ফণী চক্রবর্তী সহ ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন। ফণী চক্রবর্তীর নতুন নাম হয় ডব্লু. এ. পেন। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীও একদল বিপ্লবীদের সঙ্গে নিয়ে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশে যাত্রা করেন।

পুলিস হ্যারি এণ্ড সন্স থেকে যে-সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে গিয়েছিল তা থেকে জানতে পারে যে, বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ম হ্যারি এণ্ড সন্সের একটি সহকারী প্রতিষ্ঠান। এর পর পুলিস ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ম সার্চ করার জন্য বালেশ্বরে যায়। এম্পোরিয়মের শৈলেশ্বর বোসকে পুলিস কোন কোন কাগজপত্র সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে থাকলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। শৈলেশ্বর বোসের রকমসকম দেখে পুলিসের সন্দেহ বেড়ে যায় এবং আরও জোরদার খানাতল্লাশ সুরু করে। তার ফলে পুলিস জানতে পারে যে, ময়ূরভঞ্জ স্টেটের অত্যন্ত ভিতরে, বালেশ্বরে ২২ মাইল পশ্চিমে এক জঙ্গলের মধ্যে মোহনদিয়া নামে একটি গ্রামে শৈলেশ্বর যাতায়াত করেন। তাঁর মত উচ্চ শ্রেণীর এক ভদ্র বঙ্গসন্তানের পক্ষে ঐরূপ গ্রামে গতায়াত এক অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে পুলিসের মনে হয় এবং তাদের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। ৬ই সেপ্টেম্বর, বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঐ ব্যাপারে অনুসন্ধানে নিযুক্ত কয়েকজন পুলিস অফিসারকে নিয়ে মোহনদিয়া গ্রামে যান এবং জানতে পারেন যে, প্রায় দেড় মাইল ভিতরে জঙ্গলের মধ্যে একটি বাড়ীতে কয়েকজন বাঙ্গালী বাস করেন। পরের দিন সকালে তাঁরা সেই বাড়ীটি

সার্চ করেন, কিন্তু পুলিস আসার খবর পেয়ে যতীন মুখার্জী ও তাঁর সশস্ত্ররক্ষীরা সকলেই সেই বাড়ী ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁরা কিছু কাগজ-পত্র ফেলে গিয়েছিলেন যার মধ্যে সুন্দরবনের ম্যাপ এবং ম্যাভেরিক জাহাজ সম্পর্কে পেনাং থেকে প্রকাশিত সংবাদের সেই কাটিংটিও ছিল।

৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে ওই দলটিকে পাশের গ্রাম কাপ্তিপোদাতে দেখা গেছে এবং তারা একজন গ্রাম-বাসীকে গুলি করে মেরে ফেলেছে ও আর একজনকে আহত করছে। ম্যাজিস্ট্রেট তখন এক সশস্ত্র পুলিসবাহিনী নিয়ে সেইখানে যান এবং দেখতে পান ধানের ক্ষেতের মাঝখানে একটি ছোট্ট দ্বীপে যতীন মুখার্জী ও তাঁর দল আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা যখন সেদিকে এগোতে থাকেন, তখন যতীন মুখার্জী তাঁর মজার পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়েন। পুলিসও তখন গুলি ছোঁড়ে এবং প্রায় বিশ মিনিট ধরে উভয়পক্ষ গুলি বিনিময় করে। যে ব্যাগে বন্দুকের টোটা ছিল তার চাবি যতীন মুখার্জী হয় হারিয়ে ফেলেছিলেন অথবা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আর তিনি একটি হাতে আঘাতও পেয়ে-ছিলেন। এই অবস্থায় যতীন মুখার্জীর দলের দু'জন আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়েন। পুলিসের দল তখন জলকাদা ভেঙে এগুতে থাকে এবং দেখতে পায় যে পাঁচজনের ঐ দলটির মধ্যে একজন মারা গেছেন এবং দু'জন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। মৃত ব্যক্তিই হচ্ছেন যতীন মুখার্জী। আহতদের মধ্যে একজন অল্পক্ষণ পরেই মারা যান: তিনি ফরিদপুর দলের চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, যিনি পুলিস ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জীকে হত্যা করেছিলেন।

পুলিস আবিষ্কার করে যে, ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত সকলেই মোহনদিয়াতে থাকাকালীন নিজ নিজ নাম পাল্টে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের বীর সন্ন্যাসী-দের নাম গ্রহণ করেছিলেন। জঙ্গলে তাঁদের আবাস স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল "মায়ের সন্তান দল"(৮) নামীয় বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

১৯১৫-র শরৎকালে ম্যানিলায় নরেন যতীন মুখার্জীর মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ পান। নরেন যতীন মুখার্জীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, "আমি বিনা অস্ত্রে প্রত্যাবর্তন করবো না।" এই মর্মান্তিক সংবাদ শোনার পর তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, "যতীনদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতেই হবে।" ভারতে বিপ্লবের জন্য এবং যতীনদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য নরেন সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিভ্রমণ করেন অস্ত্রের সন্ধানে।

(৮) জেমস্ ক্যাম্বেল কার, পলিটিক্যাল ট্রাবল্ ইন ইণ্ডিয়া, (১৯০৭—১৯১৭)—পৃঃ ২৮০।

দশ ঃ অস্ত্রের সন্ধানে

জাহাজে জলপথে অস্ত্র আনার প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাবার পর নরেন দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়া যান স্থলপথে বা অন্য কোন ভাবে অস্ত্র আনার চেষ্টা করতে। মোটামুটি একটি পরিকল্পনাও ঠিক হয়েছিল, চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে আসামের উত্তর-পূর্ব, বর্তমান অরুণাচল প্রদেশ দিয়ে অস্ত্র পাঠাবার। সেই মত ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী আসামের উত্তর-পূর্বে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে গিয়ে ঘাঁটি করে। সেখানে তখন আবর উপজাতি সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল সে কারণ বিপ্লবীদের পক্ষে অবস্থা অনুকূল ছিল। বিপ্লবীরা ঠিক করেছিলেন আবর-দের বিদ্রোহে মদৎ দিয়ে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্রোহের প্রচার চালাবেন। বিদ্রোহী মনোভাব চরম পর্যায়ে উঠতে উঠতে অস্ত্র এসে পড়বে এটাই ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনার প্রধান অঙ্ক, এবং তখন ঐ সব উপজাতিদের অস্ত্রে সজ্জিত করে দেশের মধ্যে অভিযান চালানো হবে।

প্রায় ৩৫ বছর পর, নরেন, তখন মানবেন্দ্রনাথ রায়, স্মৃতিচারণ করে তাঁর "স্মৃতিকথা"য় এই অভিজ্ঞতার একটি বিবরণ লেখেন। সেই রচনাটির অংশ-বিশেষ আমি এখানে সংযোজন করছি ঃ

"জাহাজে করে অস্ত্র আনার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমি দ্বিতীয়বার যখন বিদেশে যাই তখন চীনের ভেতর দিয়ে অস্ত্র আনার একটি বিকল্প পরি-কল্পনা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই বিকল্প পরিকল্পনা অনুসারে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসার কথা। সেখানে তখন আবর উপজাতি সবে মাত্র বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। ঠিক ছিলো, অস্ত্রের সন্ধানে আমি বিদেশ অভি-মুখে পাড়ি দিলে আমাদের দলের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বিচক্ষণ তাঁর নেতৃত্বে আমাদের কিছু কর্মী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রাজ্যের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘাঁটি করবেন। তাঁরা আবর ও প্রতিবেশী উপজাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে বিদ্রোহের

উত্তেজনা ছড়াবেন এবং বাইরে থেক পাওয়া অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন।

বিকল্প পরিকল্পনা অনুসারে কিছু করার আগে আমি আর একবার চেষ্টা করলাম ইন্দোনেশিয়া থেকে জলপথে সাহায্য আনবার। পরিকল্পনা ছিলো সুমাত্রার উত্তর কোণের একটি বন্দরে অন্তরীণকৃত জার্মান জাহাজগুলোর সাহায্যে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করা এবং সেখানকার সমস্ত বন্দীদের মুক্তি করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে উড়িষ্যা উপকূলে মুক্তি বাহিনীকে নামিয়ে দেওয়া। জাহাজগুলো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলো। প্রত্যেকটিতেই অনেকগুলি করে কামান ছিলো। জাহাজের লোকেরা ছিলো মাল্লা শ্রেণীর। বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে জাহাজগুলো দখল করে রওনার কথা। প্রত্যেকটি জাহাজে যে স্বল্প সংখ্যক লোক থেকে গিয়েছিলো, তারাই জাহাজগুলোর স্টিম চালু রাখতো। বহু শত রাইফেল ও উপযুক্ত পরিমাণ গুলি বারুদ চীনা পাচারকারীদের সাহায্যে সংগ্রহ করে জাহাজগুলোতে তোলাও যেতো। পরিকল্পনা ব্যর্থ হলো কারণ জার্মানরা এই মারাত্মক অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। শেষ মুহূর্তে অস্ত্র কেনার টাকা পাওয়া গেলো না।(১) যেদিন পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে জার্মান কনসাল জেনারেলের আদেশ জারি করার কথা সেদিনই রহস্যজনকভাবে তিনি উধাও হয়ে যান। যাই হোক, আমি তাঁদের কাছ থেকে বেশ মোটা অংকের টাকা আদায় করে ভারতে পাঠিয়ে দিই যাতে আবর অভিযানে আর্থিক সাহায্য হয়।

তিতিবিরক্ত হওয়া সত্ত্বেও তখনো আমার মনে প্রচুর আশা। সেই মন নিয়ে চলে গেলাম জাপানে। রাসবিহারী বসু তখন একই উদ্দেশ্যে সেখানে ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমি খুবই অবাক হয়ে যাই। তিনি বলেন যে জাপানীদের দ্বারা এশিয়াকে শ্বেতকায়দের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার বৃহত্তর উদ্দেশ্যটি সাধিত হলে তবেই তার ফলে আমাদের ভারতোদ্ধারের সাধনা সার্থক হবে। তখনো আমি পুরোদস্তুর জাতীয়তাবাদী এবং সেই কারণে বিশ্বাস করতাম জাতিভিত্তিক সংহতিমূলক নীতিতে। তাহলেও আমি এ কথাটা ভুলতে পারলাম না যে জাপান এই যুদ্ধে ব্রিটিশের বন্ধু। ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে জাপানের সাহায্যের ওপর কী করে আমরা নির্ভর করি? আমার কূটনৈতিক জ্ঞানের অভাব দেখে রাসবিহারী অমায়িকভাবে হেসে বললেন:

(১) এ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য জেমস্ ক্যাম্বেল কার, পলিটিক্যাল ট্রাব্‌ল্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২৮৩।

জাপান মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যোগ দিয়েছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে; ভারতীয় বিপ্লবীদের যদি জাপানে লাঞ্ছিত করা হয়, তবুও জাপানকে বিরক্ত করা আমাদের উচিত হবে না। "এশিয়ার নেতা"র ওপর আমাদের আস্থা রাখা উচিত এবং সুযোগ না আসা পর্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করা দরকার। কথাগুলো খুবই ভারিক্কী শোনালো কিন্তু তাতে বিশ্বাস উৎপাদন করার মতো কিছুই ছিলো না।

ফলে আমাকে নিজের বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করতে হল। আমি চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াত-সেন-এর খোঁজ করলাম। দ্বিতীয় চীন বিপ্লব নামে খ্যাত ১৯১৩ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত নানকিং অভ্যুত্থানের ব্যর্থতার পর তিনি জাপানে আশ্রয় নেন। জাপানের এশিয়ার মুক্তির আদর্শে সান ইয়াত-সেনও বিশ্বাস করতেন। তাঁর যুক্তি ছিলো যে জাপান তার নিজ স্বার্থেই ইয়োরোপীয় শক্তিগুলির আধিপত্য থেকে মুক্তিযুদ্ধে এশিয়ার জনগণকে সাহায্য করবে। জাপানের পরেই তিনি বিশ্বাস করতেন আমেরিকাকে। তবে তাঁর সমস্ত বিশ্বাসের মূল প্রোথিত ছিলো খৃষ্ট ধর্মে। তিনি সত্যসত্যই বলেছিলেন যে নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির শর্ত হিসেবে এশিয়ার লোকেদের খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করা উচিত। আমার বয়স তখন অল্প বলেই এসব বিষয় নিয়ে তর্ক করি নি। আমার সাহায্যের আবেদন ছিল শ্বেতকায় জাতির বিরুদ্ধে এশীয় ঐক্যের ভিত্তিতে।

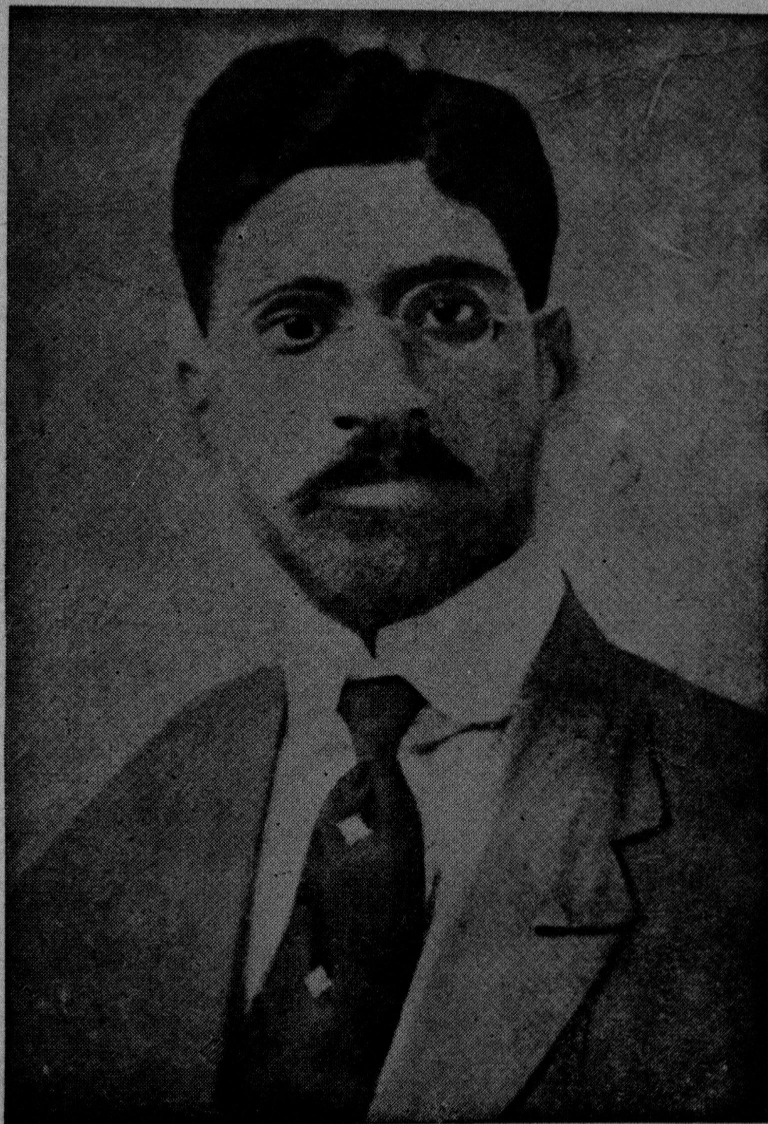
সেই সময়ের সামান্য পরেই (১৯১৫ সালের শেষে) বর্মা ও ভারতের সীমান্তবর্তী চীনের ইউনান ও সেচুয়ান দুটি প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয় ইউয়ান শি-কাই-এর বিরুদ্ধে; তাঁর পরিকল্পনা ছিলো নিজেকে সম্রাট রূপে ঘোষণা করে চীনে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার। এই বিদ্রোহই তৃতীয় চীন বিপ্লব হিসেবে অভিনন্দিত হয়। আমি স্বভাবতই ধরে নিয়েছিলাম যে এই বিদ্রোহের প্রেরণা এসেছে নির্বাসিত নেতা সান ইয়াত-সেনের কাছ থেকে। আমি প্রস্তাব করি, যদি ইউনান ও সেচুয়ান থেকে কিছু অস্ত্র সীমান্তের অপর প্রান্তে আমাদের লোকেদের হাতে পেঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে চীন ও ভারতীয় জনগণের একই স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে মিলন স্থাপিত হতে পারে। তখন তিনি আমাকে বলেন, আমাকেই চীনে জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করে জার্মান সরকারের কাছ থেকে ৫০ লক্ষ ডলার দাবি করতে হবে যাতে সেই অর্থে ইউনান ও সেচুয়ান প্রদেশের বিদ্রোহীদের কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রসামগ্রী কিনে নেওয়া যায়। তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, এই অর্থ তিনি পেলে ইউয়ান শি-কাই সমর্থকদের তিনি কিনে নিতে পারবেন এবং তাঁর পরাজয় ঘটাবেন। ফলে তৃতীয় চীন বিপ্লবের উদ্দেশ্যও সার্থক হবে। তখন সীমান্তের যে কোনো স্থানে আমার হাতে বাড়তি অস্ত্রসামগ্রী

তুলে দেওয়া হবে। স্থির হলো জার্মান রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রস্তাবটি নিয়ে আমি অবিলম্বে পিকিঙে যাবো। সফল হলে এবং সেই সংবাদ আমার কাছ থেকে জানার পরে সান ইয়াত-সেন আমাদের চুক্তি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে ইউনানে তার দূতকে পাঠাবেন। তারপর সাংহাইতে সান ইয়াত-সেনকে হাতে হাতে দাম চুকিয়ে দিয়ে আমাকে যেতে হবে সেই অর্থের বিনিময়ে মূল্যবান অস্ত্রসামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি নিজে সাংহাই থেকে রূপোর বুলেটের সাহায্যে ইউয়ান সি-কাই-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করবেন।

বিপদসঙ্কুল উদ্যোগের প্রতি আমার স্বাভাবিক টান এই বিরাট পরিকল্পনার প্রতি আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। এইবার তাহলে অবশেষে কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতের সীমান্ত দেশে প্রচুর অস্ত্র নিয়ে গিয়ে একটা সৈন্যদল গঠন করার স্বপ্ন সার্থক হবে। আমার দিক থেকে ব্যাপারটা এতই সম্ভবপর ঠেকে যে সান ইয়াত-সেন-এর প্রস্তাবের অবাস্তব কল্পনাবিলাসী দিকটা আমি একেবারেই উপেক্ষা করি। বহু বছর পরে যখন আধুনিক চীনের ইতিহাস এবং তার বিভিন্ন বিপ্লব সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানলাভ করি তখন জেনেছি যে সান ইয়াত-সেন তৃতীয় বিপ্লবের অনুমোদন করেন নি কারণ তার নেতা ইউনানের গভর্ণর ছিলেন উদারপন্থী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক লিয়ান চি-চাও এর অনুগামী। কিন্তু সেটা আরেক কাহিনী।

যাই হোক্, জাপান আমাকে ছাড়তেই হতো এবং চীনই ছিলো আমার গন্তব্য স্থান। যেদিন আমি নাগাসাকিতে এসে পেঁছিই, সেদিন থেকেই আমি কড়া নজরবন্দী। আমার কাছে টোকিয়োর একজনের ঠিকানা ছিলো, তিনি আমাকে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। বেশ কয়েক দিন ধরে গোপন ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তুতি পর্বের পর দেখা হয়। অথচ পুলিশ সবই জানতো। পুলিশের বড়কর্তা যখন আমার হোটেলে আমার জাপান পরিদর্শনের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে এলেন, তখন প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বন্ধু বসুর সঙ্গে আমি দেখা করেছি কী না। উত্তরে 'না' বলায়, তিনি একটু হাসলেন মৃদুভাবে, জাপানী কায়দায়, ভদ্র তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। কয়েক দিন পরে রাসবিহারীর একজন দূত আমাকে খবর দিল যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমাকে জাপান ত্যাগের আদেশ দেওয়া হবে এবং আমি যদি পুলিসী ব্যবস্থানুসারে সাংহাইতে বিতাড়িত হতে না চাই তাহলে যেন অবিলম্বে চলে যাই। অবশ্য আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়েছিলাম যে ওপর মহলের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও রাসবিহারী কোনো সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন না।

জাপানে আমার আর কিছু করার ছিলো না। এর ভেতরে আমি ডঃ সান



ফাদার মার্টিন রূপে নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য : ১৯১৫

ইয়াত সেন-এর সঙ্গে দেখা করেছি এবং তাঁর প্রস্তাবানুযায়ী চুক্তিতে রাজীও হয়েছি। আমাকে তো চীনে যেতেই হবে; তাহলে অবিলম্বেই কেন চলে যাই না? স্থলপথে কোরিয়ার মধ্য দিয়ে যাবার কথা আগেই আমি ঠিক করেছিলাম। কিন্তু জাপানী ডালকুত্তাদের এড়ানো বড় সহজ নয়। পরের দিন বিকেলে বড়ো একটা ডিপার্টমেন্ট স্টোরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেখানেও বিদেশীদের প্রবেশদ্বারের সামনে জুতো খুলে কাপড়ের জুতো পায়ে দিয়ে নিতে হতো। সিঁড়ি, বারান্দা, এমন কি সেই সাততলা বাড়ীর ঘরগুলো পর্যন্ত ছিমছাম, গালচে দিয়ে ঢাকা, যাতে নোংরা না হয় তাই এই ব্যবস্থা। আমি আর জুতো ফেরত নিতে এলাম না, অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা স্টেশনের দিকে চলে গেলুম। ঘণ্টা খানেক পরে সিমোনোসেকি থেকে আসা ট্রেনটি স্টেশন ছেড়ে চললো। মনে হলো, চার গোয়েন্দাকে চোখে ধুলো দিয়ে আসতে পেরেছি। তাদের বোকা বোকা হাসি আমাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল। পরের দিন সকালে পুসানে পেঁছে মুকদেন পর্যন্ত একখানা টিকেট কিনে সেখান থেকে সিউলের ট্রেন ধরি। আমার পরিকল্পনা ছিলো সিউলে প্রধান রেলপথ ছেড়ে চিমুলপো বন্দরে চলে যাবো আর সেখান থেকে পীত সমুদ্র পার হয়ে সাংহাইক্ ওয়ান্ অথবা তিয়েনসিন্ পেঁছবো। শেষেরটিই ছিলো আমার গন্তব্য স্থান। রাসবিহারী বলেছিলেন, গদর পার্টির একজন বড়ো নেতা সেখানকার জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে রয়েছেন। কিন্তু জাপানীরা যাতে আর আমার পিছু নিতে না পারে ঐ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে আমার যাত্রাপথকে আর একটু ঘুরিয়ে নিই। টিকেট করেছিলাম সাংহাইক্ ওয়ান্ পর্যন্ত, কিন্তু গোপনে জাহাজ থেকে নেমে পড়লাম দাইরেণে। তারপর মুকডেনের ট্রেন ধরলুম। সেখানে গাড়ী বদল করে পিকিঙের দিকে রওনা হই। মধ্য শীতে পীত সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর। আমি উঠেছিলাম একটা জাপানী মালবাহী জাহাজে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো খারাপ। পিকিঙের পথে ট্রেনে চেপে স্বস্তি বোধ করলাম, আমাকে আর কোনো গোয়েন্দা অনুসরণ করছে না।

পিকিঙের টিকেট কিনেছি, কিন্তু নেমে পড়ি সাংহাইক্ ওয়ানে। সেখানে রাত্রিটা কাটিয়ে লোকাল ট্রেনে চাপলাম। সেটা তিয়েন্সিন্ পর্যন্ত যায়। প্ল্যাটফরমে নামতেই একজন ইংরেজ এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। প্রাক্‌যুদ্ধ আমলে যে সব জবরদস্ত বিদেশী উপনিবেশে মাতব্বরী করতো, লোকটা পুরোপুরি সেই জাতের। লোকটা আমাকে ডেকে বললো, "সুপ্রভাত, মিঃ হোয়াইট" (ঐ নামেই আমি জাপানে পরিচিত ছিলাম)। আমি এমন ভান করলাম যে কথাটা যেন অন্য কাউকে বলেছে এবং পাশ কাটাবার চেষ্টা করলাম। লোকটি এগিয়ে এসে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে চলতে বেশ মিষ্টি

সুরেই বললোঃ "নিজের গন্তব্যস্থানে যাবার আগে কয়েক মিনিটের জন্যে আমার সঙ্গে আসবেন কী?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় এবং কেন? "পুলিশ স্টেশনে। আমি ব্রিটিশ পুলিশের অধিকর্তা।" আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম যে রেলওয়ে স্টেশনটা রুশদের অধিকৃত অঞ্চলে, জার্মান অঞ্চল সামনের রাস্তার ওপারে। একটা শেষ চেষ্টা করলামঃ "দীর্ঘপথ এসে আমি খুবই ক্লান্ত; একটা ভালো হোটেলে সোজা যাওয়াই আমার দরকার। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস আমরা ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে নেই।" লোকটি উপরিপড়া হয়ে বললো, "তা হোক, কিন্তু আমার কাজ আমি জানি। সত্যিই বেশীক্ষণ আটকে রাখতে চাই না। চলে আসুন।" আমরা রাস্তায় এলাম। সেখানে একটা মোটর গাড়ী অপেক্ষা করছিলো।

পুলিশ স্টেশনে লোকটি আমাকে কয়েকটি নিয়মমাফিক কথা জিজ্ঞাসা করলো এবং শেষে বললো, "আমার মনে হচ্ছে এখানেই আপনাকে রাতটা কাটাতে হবে। আপনার আরামের যত দূর সম্ভব ব্যবস্থা আমরা করছি। হোটেল এসটর থেকে খাবার আনতে বলেছি। আমরা জাপান থেকে কিছু সংবাদের আশা করছি।" যখন দেখলাম হেরে গেছি তখন ঝুঁকি নিয়ে বললামঃ "কি করে জানলেন যে আমি আসছি?" লোকটা হেসে উঠল। "জাপানী পুলিস খুবই দক্ষ। শুভ রাত্রি।" তিনি তো চলে গেলেন। দেখলাম আমি ভারী ভারী লোহার গরাদের পেছনে। দুজন শান্ত্রী দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। এরা ছিলো শিখ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এদের জায়গায় এলো দুজন ইংরেজ।

ঐ রকম গরাদবন্দী হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঐ অবস্থায় আমি ভাল করে ঘুমোতে পারতুম। সকালে প্রাতরাশ এলো; তারপরেই এলো পুলিশের বড়োকর্তা। "আমার সঙ্গে কনসুলেটে যেতে রাজী আছেন তো?" কথা না বলে তাকে অনুসরণ করলাম। গাড়ীতে বসে জানলাম আমাকে কনসালার আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। "কি অপরাধ?" সাহেব কাঁধ-ঝাঁকিয়ে বললোঃ "আমরা রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছি।" কন্‌সাল জেনারেল ছিলেন অভিজাত চেহারার একজন বৃদ্ধঃ পিঠউঁচু চেয়ারে বসেছিলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাজকের মতো। মুখে তাঁর বিরক্তির ভাব, স্পষ্টতই লিভারের রোগী। কিন্তু আমার সঙ্গে মোলায়েম ও ভদ্রভাবে কথা বললেন। কেন আমি জাপান গিয়েছিলাম? টোকিয়োতে কুখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর গুপ্তদূতের সঙ্গে কেন দেখা করেছি? ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছা আমার? আমি অনুতপ্তের ভান করে বললামঃ "আমি ইংলণ্ডে যেতে চেয়েছিলাম পড়াশুনার জন্যে। যুদ্ধের কারণে বাধা পড়ে। বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য বাইরে যেতে আগ্রহী হয়ে-

ছিলুম এবং জাপানে গিয়ে বিপদে পড়ি। জাহাজে একজন সহযাত্রী টোকিয়োর একটি ঠিকানা দেন। সাহায্যের প্রয়োজন হলে সেই ঠিকানায় খোঁজ করার জন্য। আমি ওদেশের ভাষা জানি না, ভাবলাম সেখানকার একজন ভারতীয় অধিবাসী আমাকে সাহায্য করতে পারেন। কিছুকাল পরেই বুঝলাম ভুল করেছি। আমাকে পুলিশের নজরবন্দীতে রাখা হয়। ভয় পেয়ে আমি বাড়ী ফিরতে চাই; পথে কিছু দ্রষ্টব্য স্থান দেখে যাবার ইচ্ছা হয়। সেজন্যেই আমি চীনে এসেছি। কোথাও আর আমি থামতে চাই না, আমি সোজা ভারতে ফিরতে চাই।"

কন্সাল জেনারেল মন দিয়ে আমার কথাগুলো শুনলেন এবং মনে হলো আমার গল্পটি বিশ্বাস করেছেন। আমার কথা শেষ হলে পুলিশের কর্তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "জাপান থেকে আর কিছু রিপোর্ট পাওয়া গেছে কি?" বিরস উত্তর এলো "না, স্যার। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তেই আসতে পারে।" ব্রিটিশ বিচারবোধ আমাকে বাঁচালো। "একে আপনি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আটক রাখতে পারেন না।" তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "বিপদে পড়েছেন আপনি। কয়েকটা দিন এখানে একটা হোটেলে অপেক্ষা করুন এবং তারপরে ভারতে ফিরে যান। এসব অঞ্চলে বিপ্লব লেগেই আছে। সেসব থেকে দূরে থাকুন।" এটা হলো পিতৃসুলভ সতর্ক-বাণী। আমি চেষ্টা করলাম খানিকটা গোবেচারা ও অনুতপ্তের ভাব দেখাতে, কিন্তু একটা দুষ্টু ভাবনা আমাকে পেয়ে বসে। বলে ফেললাম, "দয়া করে যদি একটা পাশপোর্টের ব্যবস্থা করে দেন, যাতে বিনা অসুবিধায় আমি ভ্রমণ করতে পারি।" আমার আস্পর্ধা দেখে পুলিশের কর্তার চক্ষু তো রক্তবর্ণ। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু কঠিন হয়ে বললেন, "না, তা পারি না। আমি জানিই না যে আপনি একজন ব্রিটিশ প্রজা।" দ্বিতীয়বার চিন্তা করার আগেই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, "ব্রিটিশ প্রজাই যদি না হবো, তবে আপনার পুলিস কেমন করে আমাকে ধরে আনে এবং আটক করে রাখে, স্যার?" বোঝা গেলো, বৃদ্ধ বিরক্ত হয়েছেন; উঠে যাবার সময় মন্তব্য করলেনঃ "ও, এসব হচ্ছে আইনের সূক্ষ্ম বিষয়।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর দেশীয় ন্যায়বোধ আঁকড়ে রইলেন। বিনা বিচারে কাউকেই আটক রাখা চলবে না। পুলিস ভদ্রলোক আদেশ পেলেনঃ "আসামী মুক্ত থাকবে, যতদিন না তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আরো সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে।"

পুলিসের কর্তা তো রেগে কাঁই। ঘরের বাইরে এসে তাকে বিড়বিড় করে বলতে শুনি, "বুড়ো আহাম্মক কোথাকার।" তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কোথায় যাবো? উত্তরে জানালাম, "ভালো একটা হোটেলে।" "একটি মাত্রই ভাল হোটেল আছে", তারপর বিদ্রূপের হাসি হেসে, "সেটা কিন্তু

ব্রিটিশ অঞ্চলে।" অবিচলিত ভাবে আমি জবাব দিই, সেখানেই যাব, কারণ আমিও একজন ব্রিটিশ প্রজা। পুলিশের কর্তা একজন রিক্সাওয়ালাকে ডেকে হুকুম দিলো, "অ্যাস্টোরিয়া"। খুবই চমৎকার হোটেল। গরম জলে স্নান ও ভালো খানার দরকার ছিলো আমার। তারপর আমার প্রথম কাজ হলো শহরটির একটি মানচিত্র সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখা। বিকেলের দিকে একটি রিক্সা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি শহরের দিকে। আমার পরিকল্পনা ছিলো, ছোটো নদীটার কাছাকাছি জায়গায় যাবার। তার ওপারেই জার্মান অধিকৃত অঞ্চল। কিন্তু আরো দুটি রিক্সা আমাকে অনুসরণ করে আসছিলো। অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা বড়ো দোকানে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে সেখানে ঘুরলাম। আমার অভিভাবকেরা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার একঘেয়েমি সইতে না পেরে কাছাকাছি চায়ের দোকানে ঢুকলো। আমি তখনই পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটি সরু গলিতে এসে পড়ি। সেখান থেকে নদী মাত্র কয়েক পা দূরে। বিনা কষ্টেই পেঁছে গেলাম। কিন্তু ফেরি নৌকোতে পার হতে হবে। ছোটো চৈনিক মুদ্রায় ভাড়া দিচ্ছিলো সবাই; সেরকম মুদ্রা আমার কাছে ছিলো না। মাঝির হাতে একটা রুপোর মুদ্রা গুঁজে দিলাম। অন্য যাত্রীদের রেখেই সে আমাকে নিয়ে চললো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি নিরাপদ অঞ্চলে পেঁছে গেলাম। পরের দিন সেখানে জার্মান কনসালেটের সঙ্গে যোগাযোগ করি।

আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়; তার কারণ ভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জার্মান সাহায্যের প্রতিশ্রুতির মধ্যে সততা ছিল না। কিন্তু শীঘ্রই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটে এবং পরিকল্পনাটি যুদ্ধ-কৌশলের দিক থেকে যে বিবেচনার যোগ্য একথা জার্মান রাষ্ট্রদূত স্বীকার করেন।

ড্রাগন সিংহাসনে বসার আগেই ইউয়ান শি-কাই মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে চীনে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার স্বপ্নও মিলিয়ে যায়। তৃতীয় বিপ্লব অর্থহীন হয়ে পড়ে; আর তারই ফলে যে বাড়তি অস্ত্রসামগ্রী কেনার পরিকল্পনা আমার ছিলো, তার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়। টাকার দাবী নিয়ে জার্মানদের সঙ্গে আমি যখন প্রথমবার দেখা করি তাঁরা তখন আমার পরিকল্পনার আসল ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। সান ইয়াত সেনকে সাংহাইতে টাকা দিলে সুদূর ইউনান থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমাকে দেওয়া হবে তার নিশ্চয়তা কি? বিশেষ করে, যে ব্যক্তির কাছে অস্ত্রসম্ভার রয়েছে তাঁর সঙ্গে যখন আমার কোনো সম্পর্ক নেই। সে সময় শ্বেতকায় লোকগুলির ঔদ্ধত্যে আমি বিরক্ত হই; এত বড়ো প্রবীণ চৈনিক নেতার সততাকে পর্যন্ত তাঁরা সন্দেহ করেন! আমি ভাবলাম, বিরাট পরিমাণ অর্থ হাতছাড়ার অনিচ্ছা হয়ত দূর করা যেতে পারে যদি আমার পরিকল্পনার ঐ ত্রুটি সংশোধন করে নিই। ফলে আমাকে আরো অনেকটা ঘোরাঘুরি করতে হয়। নানাবিধ দুঃসাহসিক অ্যাড-

ভেঞ্চারের পর ইউনানের নেতার সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করতে পারি।

অবশেষে আমি ফিরে আসি পিকিঙে। সঙ্গে ছিলো পাকা চুক্তিপত্র। সেটি হাংকাউতে ইউনান নেতার এক বিশ্বস্ত দূতের সঙ্গে এবং জার্মান কনসালের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মাঝখানে কেউ থাকছেন না. অস্ত্রসামগ্রী বাস্তবিকই যাঁদের হাতে রয়েছে জার্মানরা ইচ্ছা করলে অর্থ সোজা-সুজি তাঁদের হাতেই দিতে পারেন; পূর্বোক্ত পক্ষ চুক্তি অনুসারে সীমান্তের এপারে আসাম প্রদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় মাল পেঁৗছে দেবেন। কয়েক হাজারের সৈন্য বাহিনীকে সশস্ত্র করার পক্ষে তা যথেষ্ট ছিলো। একটি বাড়তি চুক্তিও হয়েছিলো। আরো অর্থ দিলে তাঁরা তিব্বত সীমানায় অবস্থিত সেচুয়ান প্রদেশের রাজধানী চেংতু শহরের বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার থেকে ভারতীয় বিপ্লবী বাহিনীকে বরাবর অস্ত্র সবরবাহ করবেন, সাদিয়ার সন্নিকটে গিরিসংকটের মধ্যের রাস্তা দিয়ে।

১৯১৬ সালের প্রথম দিকে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে রক্ষা করার উপযুক্ত কোনো সামরিক বাহিনী বাস্তবিকই ছিলো না। যে অল্পসংখ্যক সেনা ছিল তাদের ভারতীয় অফিসারেরা এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিলেন; তাঁরাও জন-গণের সশস্ত্র বিদ্রোহে যোগ দিতে তখন ইচ্ছুক। ১৯১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই আমরা সারা দেশে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরে-ছিলাম। একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে অবস্থাটা বেশ অনুকূল ছিলো। কিন্তু ঠিক মুহূর্তে জার্মানরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখল না। পোড় খেয়ে আমি পরে বুঝেছিলুম যে তারা কোনো সময়েই আমাদের সত্যি সত্যিই সাহায্য করতে চায় নি। আমার সংশোধিত পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়াকে পরিপূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য ও রণকৌশলের দিক থেকে প্রকৃষ্ট বলে স্বীকার করে নিয়েও জার্মান রাষ্ট্রদূত দুঃখ করে জানালেন, এত অর্থ ব্যয় করা তাঁর সামর্থের বাইরে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম একটা যুদ্ধে জয়লাভের জন্যে লোক ও সামগ্রী সমেত কত খরচ লাগে?

তিনি প্রস্তাব করলেন, আমি যেন অবিলম্বে বার্লিন গিয়ে সমর বিভাগের প্রধান ও তাঁর কর্মপরিষদের কাছে পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্যে পেশ করি। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বললেন, "বিদেশী সাহায্য ও উপদেশ ছাড়া কি আপনারা ভারত শাসন করতে পারবেন?" আমি পাল্টা জবাব দিলামঃ "হাঁ, কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে ভবিষ্যতে আমাদের সাহায্য পাবার সুযোগ পেতে হলে বর্তমানে আমাদের স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করা উচিত?" হেসে তিনি বিমূঢ়তার ভাবটি কাটিয়ে দেন; পরে আমার সৌভাগ্য কামনা করে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনার মতো কতজন যুবক

ভারতে আছেন?" আমি খুব নম্র সততার সঙ্গে উত্তর দিলাম, আমার মতো বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতে যে বিরাট দলটি আছে আমি তাঁদেরই একজন প্রতিনিধি।"

যখনকার কথা বলছি তখন চীনে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত ছিলেন অ্যাডমির্যাল কণ্ হিনট্জে। রাষ্ট্রদূতের কথানুযায়ী তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা আমাকে একটি মালবোঝাই মার্কিন জাহাজে প্রশান্ত মহাসাগর পার হবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্রিটিশ পুলিস হন্যে হয়ে আমার পেছনে ঘুরছে, অথচ আমাকে সাংহাই পেঁছতে হবে। পিকিং থেকে ট্রেনে আমি হাংকাউ যাই। তারপর ইয়াংসি নদী পথে নানকিং। সাংহাই পেঁছবার পর যাতে ব্রিটিশের গোয়েন্দারা সেখানে আমার খোঁজ না পায় সেই চিন্তা করে নানকিং আর ফুকোউ-এর মধ্যে নদীর মাঝখানে অপেক্ষমান একটি জার্মান গানবোটে আমাকে তুলে দেওয়া হয়। সেই জাহাজেই দেখা হল গদর পার্টির নেতা ভগওয়ান সিং-এর সঙ্গে। তাঁর বৈপ্লবিক দায়িত্ব ছিলো বামা গিয়ে সেখানকার ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ বাড়িয়ে তাদের বিদ্রোহী করা। সে কাজে ব্যর্থ হয়ে তিনি ফিরে চলেছেন আমেরিকা। তিনিও আমার মতো আত্মগোপন করে ঐ একই মালজাহাজে যাবেন।

গানবোটের অতিথি হয়ে যে এক সপ্তাহ কাটাই সেই সময়ের ভিতরেই অস্বস্তির সঙ্গে অনুভব করি যে এই লম্বা সময়ের সমুদ্রপাড়িতে ভগওয়ান সিং তেমন পছন্দসই সহযাত্রী হবেন না। প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতে মন্থরগতির ঐ জাহাজের একটি মাস লেগে যাবে। ভগওয়ান সিং ছিলেন খুব তাগড়াই গোছের লোক, প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। আমেরিকান-পুঙ্গবের স্থূল আচরণ-অভ্যাসগুলো শিখে নিয়েছিলেন, কিন্তু স্বদেশের কুৎসিত অভ্যাসগুলি ত্যাগ করতে পারেন নি। গাদা গাদা খাওয়া আর গ্যালন গ্যালন বিয়ার টানা দুই-ই তাঁর চাই। আমরা একজনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম যিনি গোপনে আমাদের সাংহাইতে নিয়ে গিয়ে সোজা মালজাহাজে উঠিয়ে দেবেন জাহাজ রওনার পূর্বমুহূর্তে। যেসব খাবার-দাবার আর পেটি-ভর্তি বিয়ার জাহাজে ওঠবার আগেই সাংহাই থেকে কিনে রাখতে হবে তার বিস্তৃত তালিকা ভগওয়ান সিং করে ফেললেন। এ হল্যে তাঁর এক মাসের জন্যে সমুদ্রযাত্রার রসদের ব্যবস্থা। স্পষ্টতই তিনি ঠিক করেছিলেন ভালো করে খেয়েদেয়ে, মদ টেনে, ফূর্তিতে সময়টা কাটিয়ে দেবেন।

অবশেষে একদিন রাতে গোপনে আমাদের সাংহাইতে পাচার করা হলো, এবং ভোর হবার আগেই মালবাহী জাহাজে আমাদের তুলে দেওয়া হলো। থাকার ব্যবস্থা দেখে মনে হলো না যাত্রাটা খুব আরামের হবে। জাহাজের হালের কাছে একটা ছোটো কেবিনের ভেতরে মাল্লাদের শোবার বাংকের নীচে

ঠায় বসে কাটাবার ব্যবস্থা। জাহাজ ছাড়তে না ছাড়তেই এক বুড়ো মাল্লা দৌড়ে এসে খবর দিল একদল ব্রিটিশ পুলিশ জাহাজে আসছে তল্লাশী করতে। আমাদের লুকোতে হবে। সে তাড়াতাড়ি বাংকের নীচেকার একটা তক্তা খুলে ফেললো। মহা অন্ধকার গর্ত সেখানে। আমাদের সেই গর্তের ভেতরে নেমে চুপচাপ উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত গর্তটা আমার সহ-যাত্রীর পেটের বেড়ের পক্ষে নিতান্তই ছোটো ছিলো। দুজন শক্ত সমর্থ মাল্লা এসে তাঁর দেহটাকে ঠেসে গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। বাংকের তক্তাটা যথা-স্থানে পেতে আবার স্ক্রু এঁটে দেওয়া হলো। জাহাজের পেটের অতল অন্ধকারে আমরা সমাধিস্থ হলাম। মনে হচ্ছিলো, আচ্ছন্ন অবস্থায় অনেক যুগ ধরে পড়ে আছি। কিন্তু হালটা জল কাটতে শুরু করলে তার ধাক্কায় ঘোরটা কেটে গেলো। বুঝলাম, জাহাজ শেষ পর্যন্ত চলতে সুরু করেছে।

আমাদের তখন লুকোবার জায়গা থেকে বেরোতে দেওয়া হলো। বেলা বেড়ে চলেছে। জাহাজ এখন উন্মুক্ত সমুদ্রের মধ্যে। আর কোনো কিছুর ভয় নেই। আমাদের বন্ধু মাল্লা আমাদের নিয়ে এলো ওপর-ঢাকা ছোটো ডেকে। সেখানে বিরাট একটা চাকার সঙ্গে জড়ানো স্টিয়ারিং-এর চেন ঘুরে চলেছে। যাই হোক্, বেশ খানিকটা খোলা হাওয়া আর আলো পাওয়া গেলো। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চেনের ঘড়ঘড় শব্দ থেমে যায়। হালের গতি মন্থর, জাহাজ আর চলছে না। বুড়ো মাল্লা দৌড়ে এসে আমাদের নীচে ডেকে নিয়ে গেলো। এর মধ্যে অন্যরা তক্তাটা খুলে ফেলেছে। একটা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ আমাদের জাহাজকে থামতে ইসারা করেছে। আমরা আবার আমাদের নিরাপদ কবরখানায় আশ্রয় নিলাম। আমার সহযাত্রীটি তাঁর খাবার ফেলে যেতে রাজী নন। খাবারের প্যাকেট তিনি সঙ্গে নিয়েই নেমে এলেন, তবে বিয়ারের বোতলগুলো ফেলে রেখে আসতে হলো। উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ার পরে কাগজের মোড়ক খোলার একটা আওয়াজ কানে এলো। আমার দয়ালু সহযাত্রীটি অন্ধকারের মধ্যেই আমার দিকে কিছু জিনিস হাত বাড়িয়ে দিলেন, "বাবুজি একটা সসেজ খেয়ে নিন।" আমি তখন জানতাম না সেটা কি বস্তু! তখনো আমি নিরামিষাশী। তিনি শুনলাম নিজেকেই শুধোচ্ছেন, লোকটা উপোস করে কতদিন চালাবে।

এমন সময়ে আমাদের ঠিক মাথার ওপরে জুতোর আওয়াজে এবং মানুষের গলার স্বরে বেশ চমকে গেলাম। অনেকগুলো লোক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মাল্লাদের ছোট কেবিনটায়। তাদের কথা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। একজন খুব কড়ামেজাজী গলায় বললো, "আমি নিশ্চিত জানি, লোকগুলো এই জাহাজেই রয়েছে। কিন্তু হারামজাদারা কোথায় লুকিয়েছে?" লোকটা আমাদের মাথার ওপরের তক্তাটায় ভারী বুট ঠুকে কথাগুলোকে আরো জোর-

দার করলো। একই সঙ্গে পাশ থেকে আমার কানে এলো একটা করুণ ফিস-ফিসানি; "বাবুজি অব তো পকড়ায়া"। খুব চেষ্টা করে হাসি চাপতে হলো,. আর ঠিক তখনই, প্রায় সেই মুহূর্তে একটা গরম তরল পদার্থের নিঃসরণে আমার জামাকাপড় ভিজে গেলো। যত ঘেন্নাই করুক সেই নোংরা অবস্থায় পড়ে থাকা ছাড়া তখন উপায় নেই। আশংকা হলো বিপ্লবী মহানায়ক হয়তো ভয়েই মূর্ছা গেছেন। একজন কড়ামেজাজের পুলিস অফিসার আমাদের মাঝিমাল্লা বন্ধুদের ওপর অনেকক্ষণ ধরে তর্জনগর্জন করলেন। তারা কিন্তু ধমক খেয়ে ঘাবড়ালো না। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। পুলিস সমস্ত জাহাজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলো, প্রত্যেকটি মাল সরিয়ে দেখলো। ব্যাপারটা কয়েক ঘন্টা ধরে চলে।

সূর্য যখন প্রায় অস্ত যাবার মুখে তখন আবার আমাদের ওপরের সেই হালের চাকাওয়ালা ছোটো ঘরটায় আসতে দেওয়া হলো। ভগওয়ান সিং তখনো উদ্বিগ্ন। প্রাথমিক প্রয়োজন মিটে গেলে তিনি খুব উদ্বেগের সঙ্গে খোঁজ নিলেন পাজীগুলো আবার রাতে আসবে কি না। আমাদের অভিভাবক বুড়ো মাল্লা আশ্বাস দিলোঃ "না. আমরা এখন ব্রিটিশ আঞ্চলিক অধিকারের বাইরে। কোবেতে না পেঁছিনো পর্যন্ত সামনে চারদিন আর কেউ জাহাজ ছুঁতে পাবে না। আর সেখানে আমেরিকান পতাকার অসম্মান করতে জাপানীরা সাহস পাবে না।"

প্রথম অভিজ্ঞতার ফলে আমার সহযাত্রীটির সাহচর্য খুবই অসহ্য মনে হচ্ছিলো। প্রায় এক মাস কাল ধরে এ অবস্থা নিশ্চয়ই অসহনীয় হয়ে উঠবে। কোবে-র পরে জাহাজ থামবে ইয়োকোহামাতে। তারপর কেটে পড়বার আর সুযোগ থাকবে না। আমি ঠিক করলাম সেখানে জাহাজ ছেড়ে প্রশান্ত সাগর পাড়ি দেবার অন্য ব্যবস্থা নেবো। নিরুপায় হলে আমি রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো। হয়তো কোনো জাপানী জাহাজে একটু জায়গা পেতে তিনি সাহায্য করতে পারেন।

কোবে বন্দরে আমাদের জাহাজে একটা রাত্রি থাকতে হলো। যখন নোঙ্গর পড়লো তখন অন্ধকার; অবশ্য কোনো জেটির কাছে নঙ্গর বাঁধা হয়নি। জাহাজটাকে এক ঝাঁক দাঁড়টানা নৌকো এসে ঘিরে ফেললো। যে কোনো একটাতে নেমে তীরে পেঁছিনা সম্ভব। সহযাত্রীকে খুব লোভনীয় একটা প্রস্তাব দিই। "একটা নৌকোয় চেপে চলুন পারে যাই এবং সময়টা ভালো করে কাটিয়ে আসি।" তিনি খুব উৎসাহ প্রকাশ করে বললেনঃ "জাপানে এসে গেইশা-পাড়া শেষবারের মতো দেখে না গেলে, খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।" আমরা আমাদের মাল্লা-বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করলাম। হালের কাছে থাকা নৌকোগুলোর একটাতে দড়ির সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিতে সে রাজী

হলো। তবে ফিরতে হবে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। তীরে নেমে সহযাত্রীকে খবরটা দিলাম ঃ "এই জাহাজে আমি আর ফিরছি না। টোকিয়োতে গিয়ে আমাকে রাসবিহারীর সঙ্গে একটা জরুরী ব্যাপারে দেখা করতে হবে; জাহাজ ধরবো ইয়োকোহামাতে।" অবাঞ্ছিত সঙ্গ এড়াবার জন্যে এটা বানিয়ে বলতে হলো। তিনি তখন তাঁর সুখের নৈশবিহারে যাবার জন্য উদ্গ্রীব। এইভাবে আমাদের বেশ সহজেই ছাড়াছাড়ি হলো। স্বস্তিবোধ করে তাড়াতাড়ি টোকিয়ো যাবার প্রথম ট্রেনটি ধরবার উদ্দেশ্যে রেল-স্টেশনের দিকে দৌড়লাম।

রাসবিহারীর সঙ্গে আবার দেখা করার ঝুঁকি আমি নিতে চাইলাম না। তাদের দেশে ফিরে আসাটা জাপানী পুলিশ যেন টের না পায়। পরের বার তাদের কবল থেকে হয়ত বেরিয়ে আসতে পারবো না। টোকিয়োতে পৌঁছে হোটেলের ঘরে বসে ঠিক করে ফেললাম কীভাবে প্রশান্ত মহাসাগর পেরোতে পারি। চীনে থাকতেই জার্মানরা আমাকে একটি ফরাসী-ভারতীয় পাশপোর্ট জোগাড় করে দিয়েছিলেন। এটি দেওয়া হয়েছিলো পণ্ডিচেরির জনৈক অধিবাসীর নামে যিনি প্যারিসে যাচ্ছেন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়তে। কিন্তু নিয়মমাফিক যাত্রী হিসেবে যেতে হলে পাশপোর্টের সঙ্গে একটা ভিসা থাকা দরকার। ভাবলাম, মুখোমুখী হয়ে একবার ঝুঁকির চেহারাটা দেখে নিই না কেন। কোটের ল্যাপেলের ওপরে একটা সোনার ক্রুশ এঁটে নিলাম আর মুখে বেশ বিষণ্ণ গম্ভীর একটা ভাব আনলাম; পরে উপস্থিত হলাম আমেরিকান কনসালেট দপ্তরে। এক তরুণী মহিলা অভ্যর্থনা করে জানতে চাইলেন আমার কী দরকার। আমার কাহিনী শুনে পাশপোর্টটি নিয়ে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। কিছুকাল পরে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কি শুধু আমেরিকান যুক্তরাজ্যের ভেতর দিকে যাবার ছাড়পত্র চাই? যদিও খৃষ্টান যাজক সেজেছি এবারও মিথ্যা কথা বললাম। বললাম, প্যারিসে যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছতে আগ্রহী, যাতে থিয়োলজিক্যাল একাডেমিতে সামনের কোর্সে ভর্তি হতে পারি। কয়েক মিনিট বাদেই পাশপোর্টটি সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন, তাতে শীলমোহর করা। ঠিক স্বর্গের না হলেও, 'ভগবানের আপন দেশের'(২)

(২) রায় আমেরিকাকে "God's Own Country" আখ্যা দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর স্যান ফ্রান্সিসকোতে যে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এম· এন· রায় সেই সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এম· এন· রায়ের প্রতিনিধি হিসাবে তায়েব শেখ ঐ সম্মেলনে যোগ দেন, ওঁর লিখিত বক্তব্য নিয়ে। তায়েব শেখকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এম· এন· রায় ওঁকে দেরাদুন থেকে যে চিঠি

দরজাটা এবার আমার সামনে খোলা। আমার খুশী নিশ্চয়ই চোখে মুখে প্রতিভাত হয়েছিলো। ঐ তরুণী (যিনি আমার জন্যে প্রায় রূপকথার পরী-র মতো কাজটি করে দিলেন) আমার করমর্দন করে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, প্যারিসে যাওয়া একটা মস্ত ভাগ্যের ব্যাপার, পারলে তিনিও আমার সঙ্গে প্যারিসে যেতেন, ইত্যাদি।

কৃতজ্ঞতায় উচ্ছল মন নিয়ে আমি পথে একটা খৃষ্টধর্মীয় বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ি। উত্তম কাগজে ছাপা এবং মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখানি বাইবেল কিনে নিজের সমরসজ্জাকে আরও মজবুত করে নিই। এরপর গেলাম এক জাহাজ কোম্পানির অফিসে এবং সেখান থেকে নিজের জন্যে প্রথম শ্রেণীর একটি টিকিট সংগ্রহ করি পরের জাহাজের জন্যে। সেটি দুদিন পরেই ছাড়বে। এইভাবে প্রশান্ত মহাসাগর নিরাপদে পাড়ি দেবার সব ব্যবস্থা করে ফেলার পর একটা বোহিসেবী কাজের কথা মনে এলো। ভাবলাম রাসবিহারীকে জানাবো, আমি জাপানে এসেছিলাম এবং আমেরিকা হয়ে জার্মানী চলেছি। এর আগের বার টোকিয়োতে এসে যে ভারতীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তাঁরই সাহায্য নিলাম। তিনি রাসবিহারীর সঙ্গে যোগাযোগ-রক্ষাকারী লোকটির কাছে আমার বার্তা পেঁৗছে দেন। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে মধ্যরাতে রাসবিহারীর দেখা হয় এবং তারপরই আমি সোজা ইয়োকোহোমা চলে যাই জাহাজ ধরতে। জাহাজ খুব ভোরেই ছাড়ে।

এই আমার প্রথম আরামজনক সমুদ্রযাত্রা। ওটা ছিলো বড়ো ধরনের একটি সৌখীন জাহাজ। সে সময়ে খুব দ্রুতগামী জাহাজেরও প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করতে দু সপ্তাহ লেগে যেতো। শুধু একদিন থামতো হনলুলুতে। সাংহাই থেকে কোবে পর্যন্ত আত্মগোপন করে জাহাজে যাওয়া আমার জীবনে লুকিয়ে জাহাজে ঘোরার প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। চীন সাগরের ওপর দিয়ে যাওয়া-আসা, জাভা থেকে ইন্দোচীন যাওয়া এবং ফেরা, আবার জাভা থেকে ফিলিপাইন, এসব ঐভাবেই করেছি। খুব আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নয়; কিন্তু কোনো কোনো সময়ে সত্যিই বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। বিশেষ করে, মাঝদরিয়ায় লাইফবোটের সাহায্যে এক জাহাজ থেকে অন্য জাহাজে যাওয়া। এটা করতে হতো হংকং এড়াবার জন্যে।

আগে আমি দুবার টিকিটকাটা যাত্রী হয়ে বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে গেছি মাদ্রাজ থেকে পেনাং এবং সেখান থেকে মাদ্রাজ। তখন পাশপোর্টের

পাঠিয়েছিলেন তাতে উনি লেখেন: "You are going to 'God's Own Country'।"

দরকার ছিলো না। তবে তখন আমি ছিলাম একেবারে কাঁচা। প্রথম শ্রেণীর জাহাজযাত্রীদের ইয়োরোপীয় কায়দার জীবনযাত্রা আমার অজানা ছিলো। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা সকলেই পুরোদস্তুর ব্রিটিশ; কেউ ডাঁটওয়ালা জঙ্গী অফিসার, কেউ সরকারী দপ্তরের বড়ো সাহেব, কেউ রাবার বাগানের মালিক। সে সব দিনে দেশীয়দের প্রতি তাদের আচরণের মধ্যে হিম করুণার ভাব অথবা দাম্ভিক বিরূপতার ভাব ছিল প্রবল। ফলে মাদ্রাজ-পেনাং যাতায়াতের সময় আমার অস্বস্তি লেগেছিলো, সেই সমুদ্রযাত্রা আমি মোটেই উপভোগ করতে পারিনি।

প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে এবারের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা ছিলো একেবারে অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা। এর ভেতরে আমি অনেক বেশী অভিজ্ঞ মানুষ হয়ে উঠেছি। তখনো আমি নিরামিষাশী বটে, কিন্তু ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে টেবিলে খানা খেতে এবং পোষাক পরতে শিখেছি। অপরিচিতের সান্নিধ্যে আর অস্বস্তি বোধ করি না।

একদিন সকালে ডেকের ওপরে একটা লক্ষণীয় দৃশ্য চোখে পড়লো। আগের দিন পর্যন্ত সব জাপানী যাত্রীরাই নিজেদের জাতীয় পোষাক পরে-ছিলেন। সেদিন সকালে দেখি কিমানোগুলো উধাও; জাপানী যাত্রীরা সবাই ঠিকঠাক ইয়োরোপীয় পোষাক পরেছেন। হঠাৎ এই খোলস পালটানোর কারণ হলো, জাহাজ হনলুলুর কাছে এগোচ্ছে। বিকেলের দিকে আমরা আমেরিকান সভ্যতার বহির্ঘাটিতে পেঁাছে গেলাম।

* * *

প্রায় দেড় বছর কাল মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপিন, জাপান, কোরিয়া এবং মহাচীনে ঘোরাফেরা করার পর ১৯১৬ সালের গ্রীষ্মকালে আমি স্যান ফ্রান্সিসকোতে এসে পেঁাছই। যে মানুষটি প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে এল কাগজপত্রে সে প্যারিসগামী এক যুবক, পণ্ডিচেরি থেকে সেখানে যাচ্ছে ধর্মশাস্ত্র নিয়ে উচ্চশিক্ষালাভের অভিলাষে। তার হাতে এক কপি বাইবেল, বুকে ঘাড়ের চেন থেকে ঝুলছে একটি সোনার ক্রুশ। যুদ্ধের হিস্টিয়ার লক্ষণ তখনই আমেরিকায় বেশ প্রকট হয়ে উঠেছে। তারই একটি ধাক্কা এই অখ্যাত আগন্তুককে পেঁাছনমাত্র স্বাগত করল।

আমি স্যান ফ্রান্সিসকোতে পেঁাছবার পরদিন সকালেই খবরের কাগজের শিরোনামায় বড় বড় হরফে ছাপা দেখলামঃ "মার্কিন দেশে রহস্যময় বিদেশীর আগমন—বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বিপ্লবী না বিপজ্জনক জার্মান গুপ্তচর?" তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম; গেলুম নিকটবর্তী প্যালো অ্যালটো শহরে, সেখানে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি। স্ট্যান-ফোর্ডে খুঁজে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলাম; বয়স অল্প

হলেও সাহিত্যিক হিসেবে তখনই তার বেশ নামডাক। আমার বন্ধু যাদু-গোপালের ছোট ভাই; খুব খুশী হয়েই আমাকে স্বাগত জানালো; পরামর্শ দিলো পুরোনো জীবনকে মুছে ফেলে নতুন নামে নতুন জীবন সুরু করতে। সেই সন্ধ্যায় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার ভেতরে এম· এন· রায়ের জন্ম হল।”

উপসংহার

১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে একটি ১০-সদস্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন ভারতবর্ষে আসে, কি পদ্ধতিতে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় সে সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের মনোভাব বুঝতে। এই ডেলিগেশনের নেতা লর্ড চরলে এম· এন· রায়ের সঙ্গে দেখা করেন আমাদের বেহালার বাড়ীতে, সঙ্গে ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এ· জি· বটম্‌লে, যিনি পরবর্তীকালে ব্রিটেনের কমনওয়েলথ দপ্তরের মন্ত্রী হন। বটম্‌লে ভারত-ভ্রমণের পর থেকেই ইংলণ্ডে (এম· এন·) রায়-পন্থী হিসাবেও পরিচিত হন। ওঁরা বিকালে আসেন; আমার ওপর রায় ভার দিয়েছিলেন ভাল করে চা তৈরী করতে।

পরিচিতি-পর্ব শেষ হতে আমি এবং এলেন (মিসেস এম· এন· রায়) পাশের ঘরে চা তৈরী করতে যাই। মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই খুব চেঁচামেচি শুনে আমরা সামনের ঘরে এসে দেখি রায় এবং চরলে, দুজনেই সমান লম্বা, দাঁড়িয়ে এবং বটম্‌লে সাহেব তাঁদের ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। আমি রায়ের শেষ কথাটি শুনতে পাইঃ "If you transfer power to the Congress and the Muslim League, the blood of the Indian people will be on your hands"। (কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে যদি তোমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করো, অর্থাৎ দেশকে জাতির ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত করো, তাহলে দেশে রক্ত বন্যা বইবে আর তার জন্য তোমরাই দায়ী হবে। সেদিনকার সাক্ষাৎ ওখানেই শেষ. পরের দিন বটম্‌লে এবং যত দূর মনে পড়ছে মাইকেল ফুট আসেন রায়ের সঙ্গে আলাপ করতে।

আগের দিন রায়ের রাগত মুখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, যে মানুষ বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জীবনপণ করেছিলেন এবং দেশ থেকে বিজাতীয় শাসকদের বিতাড়ণ করবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করে-ছিলেন তাঁকে দেশ-বিভাগ, বিশেষ করে জাতির ভিত্তিতে, কতখানি আঘাত

দিয়েছিল। পরের দিন শ্নেছিলাম রায় চরলেকে বলেছিলেন যে, যদি ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে কংগ্রেস এবং ম্সলিম লীগকে, ভারতের দ্ই প্রধান জাতির প্রতিনিধি হিসাবে, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে—তাহলে তাঁর (রায়ের) সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যুক্তি কি। সেই যুগের বৈপ্লবিক রাজনীতি যে রায়ের মানসিকতায় শেষদিন পর্যন্ত কতখানি জায়গা জুড়েছিল তা তাঁর পরবর্তীকালের বহু লেখা এবং কথাবার্তা থেকেও পাওয়া যায়। বস্তুত, পাশ্চাত্য দর্শন, জীবনধারা এবং মার্কস-এর মৌলিক দার্শনিক ধ্যান-ধারণা মেনে নেবার পরও তাঁর মনের মধ্যে যে বাঙ্গালী বিপ্লবী ধারা ছিল সেটা তাঁর পরবর্তীকালের লেখা থেকে খুবই স্পষ্ট।

১৯৩৯ সালের ৩০শে জুলাই 'ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর একটি প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ লেখেন:

> "দেশ ছাড়ার আগে চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আমার কয়েকবার দেখা হয়েছিল......অরবিন্দ ঘোষের মামলায় তাঁর অপূর্ব সওয়াল ও বাগ্মীতা তাঁকে রাজনীতিতে টেনে আনে......তখনকার রাজনীতি ছিল সত্যই বৈপ্লবিক।"

এই বৈপ্লবিক রাজনীতির একজন নেতা হিসাবেই মানবেন্দ্রনাথ (তখন তিনি পিতৃদত্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য নামে পরিচিত) ব্যাটাভিয়া যান জার্মানদের সঙ্গে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব সাধনের প্রয়োজনে অস্ত্র আনার ব্যবস্থা করতে। প্রথমবার যান ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে এবং দ্বিতীয়বার ১৯১৫ সালের অগাস্ট মাসে—চার্লস মার্টিন ছদ্মনামে। এই দ্বিতীয়বার দেশ ছাড়ার পর চীন, জাপান, ফিলিপিনস প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের সব দেশ ঘুরে নরেন ভট্টাচার্য জার্মানী যাবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা পৌঁছান ১৯১৬ সালের জুন মাসে। বঙ্গ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলন থেকে যার শুরু তারই পরিণতি এই সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রস্তুতিতে।

বছর তিনেক আগে আমেরিকার পশ্চিম কূলে বার্কলে শহরে এলিয়ট পোর্টার নামে এক অপেশাদার ভারত-গবেষকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এলিয়ট তার আগে মানবেন্দ্রনাথের প্রথম স্ত্রী এভেলিন সম্পর্কে আমার একটি রচনা পড়ে মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমাকে একটি চিঠি লেখেন। বার্কলেতে তাঁর ফ্ল্যাটে আমি বেশ কয়েকদিন যাতায়াত করি তাঁর কমপিউটার যন্ত্রে সঞ্চয় করা মানবেন্দ্রনাথের এবং আমেরিকা-প্রবাসী হিন্দু এবং জার্মানদের সম্পর্কে বহু তথ্য পড়বার জন্য। এলিয়ট একটি ছোট্ট টেলিভিশন কোম্পানীর মালিক। বছর ৪০ বয়স। তাঁর মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই আগ্রহ কেন জানতে চাইলে, এলিয়ট বলেন যে, বার্কলেতে ছাত্রাবস্থায় এলিয়ট ভারতবর্ষ সম্পর্কে দু'একটি কোর্স নেয়। পড়াশুনা শেষ

করার কয়েক বছর পর এলিয়টের ইচ্ছা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নেতাজী সুভাষ বসুর কার্যকলাপ সম্পর্কে গবেষণা করার। প্রায় বছর তিনেক জার্মানী এবং ইংলণ্ডের গবেষণাকেন্দ্র এবং মহাফেজখানাগুলি থেকে বহু নথি-পত্র উদ্ধার করার পর এলিয়টের মনে হয় যে, এর শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় —যার এক শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। তখন তিনি জার্মানী, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা থেকে মানবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহযোগীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। কিন্তু মাঝখানে আরও বছর তিনেক নিজের টেলিভিশনের ব্যবসাটি প্রতিষ্ঠা করতে কেটে যায়।

এলিয়টের সংগ্রহ করা অনেক তথ্য ও দলিলের মধ্যে থেকে আমি একটি চমকপ্রদ দলিল পাই। এটি হলো স্যান ফ্রান্সিসকো শহরে অবস্থিত উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের এ্যাটর্নী প্রেস্টন সাহেবের একটি গোপন নোট—অধ্যাপক আর্থার উপ্‌হাম পোপ সম্পর্কে—ওয়াশিংটনে মার্কিন সরকারের এ্যাটর্নী জেনারেলকে লেখা—১৯১৮ সালের ২রা এপ্রিল। অধ্যাপক পোপ আমেরিকায় মানবেন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠেন, যদিও মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় এ'র নামোল্লেখ করেন নি, যেমন তিনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিন সম্পর্কেও করেন নি। এলিয়ট পোর্টার এখন অধ্যাপক পোপ এবং আমেরিকায় হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বই লেখার কাজে মনোযোগ দিয়েছেন।

মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কয়েক মাস পর অধ্যাপক পোপ তাঁর বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপনার কাজটি ছাড়তে বাধ্য হন। তখন তিনি আমহার্স্ট কলেজে একটি অধ্যাপনার কাজ পান কিন্তু সেটিও ঐ একই কারণে তাঁকে ছাড়তে হয়। তারপর তিনি আমেরিকার যুদ্ধ-বিভাগে একটি চাকরী নেন। ঐ নোটটিতে এ্যাটর্নী প্রেস্টন ওয়াশিংটনের এ্যাটর্নী জেনারেলকে লেখেন কি কারণে পোপকে ঐ চাকরীতে রাখা যেতে পারে না।

> "অধ্যাপক আর্থার পোপ লালা হরদয়ালের সঙ্গে ১৯১১ সালে পরিচিত হন এবং তখন থেকেই হিন্দু বিপ্লবীদের সহযোগী হন।...... কিন্তু সব থেকে ন্যক্কারজনক হলো হিন্দু বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব। এই নরেন্দ্র হলেন ভারতবর্ষের সব থেকে হিংসাত্মক বিপ্লবী। নরেন্দ্রকেই ভার দেওয়া হয়েছিল 'ম্যাভারিক' জাহাজে প্রেরিত জার্মান অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করতে।......১৯১৬ সালের মাঝামাঝি 'মার্টিন' ছদ্মনামে নরেন্দ্র স্যান ফ্রান্সিসকো শহরে আসেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই নিজের নাম পরিবর্তন করে মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকার পশ্চিমকূলে জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ

করে রায় নিউ ইয়র্কে যান। নিউ ইয়র্ক থেকে জার্মান সাবমেরিন 'ডয়েচল্যাণ্ড'-এ ওঁর বার্লিন যাওয়ার কথা ছিল—দক্ষিণ চীনের এক যুদ্ধ নেতার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে। এটি কোন কারণে ভেস্তে যায়। তার কিছুদিনের মধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিন্দু-জার্মান ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে, তখন রায় 'ম্যানুয়েল মেণ্ডেজ' নাম নিয়ে মেক্সিকো পালিয়ে যান......আমেরিকান মহাদেশে অবস্থিত ঐ লোকটিই সব থেকে বিপজ্জনক এবং এখনও উনি এই মহাদেশে উপস্থিত।"

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডঃ ডেভিড জর্ডান এবং সতীর্থ বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাই ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের কথা লিখেছেন। এও লিখেছেন যে ডঃ জর্ডান তাঁকে মেক্সিকোর সোশ্যালিস্ট জেনারেল এ্যালভারেডোর কাছে যে পরিচিতি-পত্র দিয়েছিলেন তার জন্য তিনি মেক্সিকোয় পৌঁছাবার পর সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। ডঃ জর্ডান এবং ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, দুজনেই—তিনি যখন ১৯৪৯ সালে 'স্মৃতিকথা' লিখতে শুরু করেন—তার বহু পূর্বে মারা গেছেন; জর্ডান ১৯৩৫ সালে এবং ধনগোপাল ১৯৩৬ সালে। ধনগোপালই তাঁর স্ট্যানফোর্ডের বসবাস এবং আমেরিকান শিল্পী ও বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী এভেলিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। রায় তাঁর স্মৃতিকথায় ডঃ জর্ডান ও ধনগোপালের কথা লিখেছেন কিন্তু অধ্যাপক পোপ এবং এভেলিন দুজনেই তখনও জীবিত এবং আমেরিকায় বসবাসকারী; আমেরিকার সরকার কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে তৎকালীন কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের কথা ভেবেই তিনি সম্ভবত ওঁদের কথা লেখেন নি। মানবেন্দ্রনাথ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে যোগ দেওয়ার পর থেকেই মার্কিন গোয়েন্দাচক্রের কাছে তিনি কমিউনিস্টই রয়ে গিয়েছিলেন, যদিও তার বহুপূর্বেই তিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে তাঁর নিজের সংগঠিত 'র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' ভেঙ্গে দিয়ে মানবতার ভিত্তিতে মার্কসবাদ সংশোধন করে নতুন দর্শন 'নয়া মানবতাবাদ' প্রবর্তন করেন।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন যে মেক্সিকো থাকাকালীনই তিনি সাম্যবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনে আকৃষ্ট হন যার ফলে তিনি ১৯১৯ সালে মেক্সিকোতে রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় এ কথাও লিখেছেন: "সাম্যবাদের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই তার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাৎপর্যের জন্য", তবে তার সঙ্গে তিনি সংযোজন করেছেন "যারা 'আনন্দমঠ' থেকে বিপ্লবী প্রেরণা পেয়েছে

তাদের কাছে সাম্যবাদের কাল্পনিক সুখী জগতের লক্ষ্য বা মানবিকতার আদর্শের মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই" (স্মৃতিকথা, পৃঃ ৫৯)। ১৯৪৬ সালের মে মাসে দেরাদুনে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টীর শিক্ষা-শিবিরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই একই ভাবধারায় মানবেন্দ্রনাথ বলেনঃ

"যখন চোদ্দ বছর বয়সে আমি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিই, যা হয়তো কোনদিনই সাফল্য লাভ করবে না, তখন আমরা (দেশের এবং মানুষের) মুক্তি চেয়েছিলুম। (জাতীয়) স্বাধীনতার আদর্শ আধুনিক-কালের। পুরাতনপন্থী বিপ্লবীরা মুক্তির আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তখন আমরা মার্কস-এর লেখা পড়িনি, সর্বহারাদের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলাম না। তবুও অনেকেই তাঁদের জীবনের অনেক সময়ই জেলে কাটিয়েছেন এবং ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছেন...সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি আমার রাজনৈতিক জীবন শুরু করি, এবং আজও সেই আদর্শই আমাকে অনুপ্রেরণা যোগায়— মার্কসের তিন খণ্ড 'ক্যাপিট্যাল' বা মার্কসবাদীদের শত শত বই থেকে আমি সেই অনুপ্রেরণা পাই না।(১) আর, এই মুক্তির আদর্শই আজকের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের সৃষ্টি করেছে।"

মানবেন্দ্রনাথের প্রথম জীবন, 'দি রেস্টলেশ ব্রাহ্মিণ' (অশান্ত ব্রাহ্মণ) লেখার সময় তাঁর সমসাময়িক অনেক বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আমি দেখা করি এবং তাঁদের সাক্ষাৎকার নিই। এটি আমার জীবনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা। শেষ যাঁর সঙ্গে দেখা করি তিনি হলেন সতীশ চক্রবর্তী। যুগান্তর দলের কলকাতা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। ৪/৫ দিন ধরে তাঁর সঙ্গে তাঁর বেহালার বাড়ীতে সাক্ষাৎকার চলে। শেষ দিন, সাক্ষাৎকার শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তিনি আমায় বলেনঃ "আমি হয়তো আর বেশীদিন বাঁচবো না। একটা কথা বলে যাই, তবে এটা আপনি ছাপবেন না।"। আমি কথা দিয়েছিলুম উনি বেঁচে থাকতে ছাপবো না। আমার বই প্রেসে দেবার সময় উনি পরলোকগমন করেন। উনি আমায় বলেছিলেনঃ "স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেজিস্ট্রার থিবো (Thibault), সংস্কৃত পণ্ডিত, ওঁকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্কালে বলেন যে কলিকাতাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত ওঁদের বিপ্লবী দলের প্রতি-

(১) এই সময় থেকেই মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদ এবং দলীয় রাজনীতির মৌলিক ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন, এবং ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নিজের পার্টি ভেঙ্গে দিয়ে 'নয়া মানবতাবাদ' দর্শন প্রবর্তন করেন এবং এই দর্শনের ভিত্তিতে আন্দোলন শুরু করেন।

নির্ধির সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী, ওঁরা যেন শীঘ্র যোগাযোগ করেন।” থিবো সাহেবের বার্তাটি উনি নরেন ভট্টাচার্যকে জানান এবং সেই মত নরেন ভট্টাচার্য এবং পরে যতীন মুখোপাধ্যায় জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এই গোপনীয়তাকে বাংলার বিপ্লবীরা রক্ষা করে গেছেন আমৃত্যু। সতীশ-বাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারটি হয় ১৯৬৮ সালের শেষদিকে—ভারত স্বাধীন হওয়ার ২১ বৎসর পর। তখনও তিনি খবরটি গোপন রাখতেই চেয়েছিলেন। এই আদর্শের অনুপ্রেরণা ছিল 'আনন্দমঠ'—সমস্ত বিপ্লবীই একথা আমায় বলেছেন এবং অনেকেই লিখেও গেছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উপর উপরি-লিখিত নিবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ আরও লিখেছিলেনঃ "গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালে আমার এক দূত তাঁর (চিত্তরঞ্জন দাশ) সঙ্গে দেখা করেন আমার একটি চিঠি নিয়ে। চিঠিতে আমি যা লিখে-ছিলুম সে সম্পর্কে তিনি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করেন; ঐ পত্রবাহক মারফৎ উনি আমায় যা জানিয়েছিলেন তা' আমাকে এখনও গোপন রাখতে হচ্ছে।"

১৯৪১ সালের শেষদিকে, তখনও নেতাজী সুভাষ বসু জাপানে যান নি, রাসবিহারী বসুর এক ভারতীয় দূত মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন একটি গোপন বার্তা নিয়ে। বার্তাটি ছিল আই· এন· এ· গঠন সম্পর্কে এবং তার জন্য দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় একটি সংগঠন তৈরী করা যে সংগঠন আই· এন· এ'র অগ্রসরকে দেশের মধ্যে সাহায্য করবে। ১৯৪২ সালে অগাস্ট আন্দোলনের প্রস্তুতি সেই উদ্দেশ্যেই হয়েছিল।

এক সাক্ষাৎকারে জয়প্রকাশ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করি "রায় সম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আপনাদের কি মত ছিল?" জয়প্রকাশজী আমাকে বলেনঃ "আমরা রায়কে বুঝতাম। জানতাম তিনি আমাদের পথ সমর্থন করেন না। কিন্তু তাঁকে আমরা সব কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করতুম না, আলোচনাও করেছি। কারণ, আমাদের বিশ্বাস ছিল তিনি আমাদের কথা গোপন রাখবেন। এই বিশ্বাস অন্যদের সম্পর্কে আমাদের ছিল না।"

বৈপ্লবিক রাজনীতির মূল ভিত্তিই ছিল গোপনীয়তা এবং একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস। ঐ যে দূত রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে রায়ের কাছে এসেছিলেন ১৯৪১ সালে, সে সম্পর্কে ১৯৪৬ সালেও রায় লিখছেনঃ "সেই দূত আমাকে বলেছিলেন অন্যদের সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন এবং যাঁদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন বা করবেন তাঁদের নামও তিনি আমাকে বলেন।...... কিন্তু এসব তথ্য এখনও আমাকে গোপন রাখতে হবে" (আই· এন· এ· এ্যান্ড দি অগাস্ট রেভলিউশন—মানবেন্দ্রনাথ রায়, ১৯৪৬; পৃঃ ৬৩)।

বাংলাদেশের বিপ্লবীদের শপথ নিতে হতো গোপনীয়তা রক্ষা করার।

'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইতে হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর নিজের সম্বন্ধে লিখে-ছেনঃ তিনি ১৯০২ সালে 'গীতা' হাতে ধরে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে অরবিন্দ ঘোষের কাছে শপথ নিয়েছিলেন দেশকে বিজাতীয় শাসন থেকে মুক্ত করবেন এবং বিপ্লবী সংগঠনের গোপনীয়তা রক্ষা করবেন এবং সেই গোপনীয়তা যদি রক্ষা না করেন তাহলে সমিতির সভ্যের হাতে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবেন।

মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও দর্শন নিয়ে আমেরিকায় মিশিগ্যান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রয়াত রিচার্ড পার্ক-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাতে এবং চিঠি-পত্র মারফৎ অনেক আলোচনা হয়। অধ্যাপক পার্ক ১৯৪০ দশকের শেষদিকে মানবেন্দ্রনাথের বিশেষ সুহৃদভাজন হয়েছিলেন।

"আমার মনে হয় (মানবেন্দ্রনাথ) রায়ের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক মনোভাব থেকে গিয়েছিল।...শেষ জীবনে তিনি বোধহয় তাঁর দার্শনিক 'ধ্যান-ধারণা' নতুন করে চিন্তা কর-ছিলেন, কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি তার কোন প্রকৃষ্ট রূপ দিতে পারেন নি।"

১৯৪৯ সালে মানবেন্দ্রনাথ 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া' পত্রিকায় দুটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি ২৭শে ফেব্রুয়ারী যতীন মুখোপাধ্যায়-এর উপর যাতে তিনি লেখেনঃ "আমি পৃথিবীতে বহু মহান ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছি যাঁরা সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু যতীনদার মত সৎ এবং ভাল লোক আমি দেখিনি। যতীনদা ছিলেন সততা এবং মানবিকতার প্রতীক।" আর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লেখেন বাংলার প্রথম শহীদ, ক্ষুদিরাম বসুর উপর ১৭ই এপ্রিল। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ লেখেনঃ

"ক্ষুদিরামের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লর (চাকি) সঙ্গে তাঁদের তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে আমি দেখা করেছিলুম (মজফফরপুরে ইংরাজ গভর্নরকে হত্যা করবার জন্য বাংলার বিপ্লবী দল ওঁদের পাঠান—সেই যাত্রাকেই মানবেন্দ্রনাথ তীর্থযাত্রা আখ্যা দিয়েছেন)। (হ্যাঁ,) ওটি তীর্থযাত্রাই ছিল, কারণ ওঁরা একজন অত্যাচারীকে নিধন করবার জন্য যাননি, ওঁরা গিয়েছিলেন নিজেদের মায়ের (দেশমাতৃকা) কাছে উৎসর্গ করতে—কারণ মা মানুষের রক্ত চেয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম এবং ঐসব পূর্বসূরীদের কাছে, জাতীয়তাবাদ ছিল ধর্ম, এবং তাঁরা ঐ আদর্শে অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রতী ছিলেন। জাতীয়তাবাদ তাঁদের কাছে ক্ষমতালাভের পন্থা ছিল না। জাতীয়তাবাদ, স্বদেশের

মুক্তির আদর্শ, ছিল তাঁদের তপস্যা, তাঁদের আত্মোৎসর্গের সাধনা। ক্ষুদিরাম নিজে ছিলেন সততা এবং সত্যের প্রতীক; কোনরকম অসৎ মনোভাব তাঁর আদর্শকে ক্ষুন্ন করতে পারেনি; প্রতিশোধ, হিংসা বা ঘৃণার মনোভাব তাঁর আদর্শকে ম্লান করতে পারেনি। বাক্সে বোমা এবং পকেটে পিস্তল নিয়ে তিনি তাঁর দৈবনির্দিষ্ট তীর্থযাত্রায় যাত্রা করেন—কোন ব্যক্তির জীবন নাশ করার জন্য নয়;—ঐগুলি ছিল তাঁর কাছে অঞ্জলির ফুলের মত, যে ফুল নিয়ে একজন ভক্ত মন্দিরে প্রবেশ করে তার ইষ্টদেবতাকে অর্ঘ প্রদান করতে। ক্ষুদিরামের মত নিঃস্বার্থ আদর্শবাদী মানুষেরা রাজনীতিবিদ বা বাস্তববাদী ছিলেন না, ওঁরা ছিলেন আদর্শ-বাদী; মহৎ আদর্শ এবং আশা তাঁদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।"

দ্বিতীয়বার ব্যাটাভিয়া যাবার আগে মানবেন্দ্রনাথ কপ্তিপোদায় যতীনদার (যতীন মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে দ্বিপ্রাহারিক আহারের পর প্রায় দু' ঘন্টা আলোচনা করেন। শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নলিনীকান্ত কর তখন উপস্থিত ছিলেন। কি আলোচনা হয় জিজ্ঞাসা করায় নলিনীবাবু হেসে আমাকে বলেনঃ "না, বিপ্লবের কৌশল নিয়ে নয়। আলোচনা হয় 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে। ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার, সগুণ না নির্গুণ। জীবনের শেষদিকে মানবেন্দ্রনাথ বলতেন, "আমি 'সচ্চিদানন্দে' বিশ্বাস করি", মানবেন্দ্রনাথের সহযোগী পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী মানবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে একথা বলেন।

ব্রহ্ম'র অস্তিত্ব আছে কিন্তু সেই অস্তিত্ব আমাদের জ্ঞানের পরিধির বাইরে—সেই জন্য নিরাকার; ব্রহ্ম কেবলমাত্র অনুভবগম্য। ব্রহ্ম যখন সাকার তখন ব্রহ্ম'র প্রকাশ সমস্ত দৃশ্যমান এবং অদৃশ্যমান বস্তুতে। দৃশ্যমান জগতের মধ্যে ব্রহ্ম'র প্রকাশ হচ্ছে—এই পৃথিবী, আকাশ, পাহাড়, নদনদী, বৃক্ষ প্রভৃতি—এ সকলই সেই সগুণ ব্রহ্ম'র প্রকাশ; ব্রহ্ম'র অস্তিত্ব সগুণ এবং নির্গুণ উভয়তঃ। ব্রহ্ম যখন 'স্ফীত' হন তখনই সৃষ্টি হয়। সে কারণে ব্রহ্ম সৎ। ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য, এই কারণে চিৎ; এবং সত্তা ও চৈতন্যের কারণে ব্রহ্ম'র আনন্দ নিত্য। তাই ব্রহ্ম সৎ, চিৎ, এবং আনন্দ।

'সৎ'-এর অর্থ—যার অস্তিত্ব আছে। সে কারণে সমস্ত জড় পদার্থকে বলা হয় 'সৎ'। অন্ন, বল, জল, তেজ, আকাশ, মানুষের স্মৃতি, আশা—এ সবই প্রাণকে ঘিরে। এ সবই 'সৎ' এবং 'জড়'।

'চিৎ'-এর অর্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, চৈতন্য, জ্ঞানশক্তি। 'জড়' বা 'সৎ'কে বাদ দিয়ে "জ্ঞান-বিজ্ঞান-উপলব্ধি" হয় না। 'সৎ' বা 'জড়' থেকে উৎপন্ন মানুষের যে চৈতন্য তা জড়-নির্ভর। জড়কে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান হয় না। আবার জড়বস্তু সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান না হলে বিজ্ঞানের স্ফুরণ হয় না।

এই বিজ্ঞানের স্ফুরণ হলে জড় (সৎ) ও চিৎ-এর মধ্যে যে কৃত্রিম ভেদ আছে তা লুপ্ত হয়ে যায় বিজ্ঞানীর কাছে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে মনের বা চিত্তের সম্বন্ধ। চিত্ত হতে চেতনা। চেতনা হতে সঙ্কল্প। চেতনা হতে নানাপ্রকার সংকল্প হতে পারে, যেমন আত্মোন্নতি, সমাজ-ব্যবস্থা বিষয়ক। সঙ্কল্প কল্পনায় থাকতে পারে, বাস্তবে রূপ নিতে পারে। সঙ্কল্পের বাস্তব রূপায়ণে হয় অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা আসে সাফল্য ও অসাফল্য উভয় হতেই।

'আনন্দ'—চিত্তের বা মনের বা জ্ঞানের প্রসারতা থেকে আনন্দের জন্ম। সঙ্কল্প শক্তির মূলে আছে কল্পনা বা চেতনা। মন যেখানে ক্ষুদ্র, সেখানে সংসার জুড়ে কেবল ছোট মনের কথা, ছোট বা স্বার্থশিলষ্ট ক্ষুদ্র কাজ, বাদ-বিবাদ, হিংস্র আক্রমণ, পরনিন্দা প্রভৃতি প্রবল।

ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৃহৎ, মহৎ। এই বৃহত্ত্ব, মহত্ত্ব বিশ্বের ধর্ম বা স্বভাব। মানুষের মধ্যে যিনি মহৎ, বৃহৎ তিনি ব্রহ্মের এই সত্য নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেন। ব্রহ্মবিষয়ক এই উপলব্ধি তাঁকে করে 'ব্রাহ্মণ'। যিনি জ্ঞানবান্ তিনি দেখেন বিশ্ব জুড়ে রয়েছে বিরাট প্রশান্তি ও আনন্দ। তিনি দেখেন সকল জড়দ্রব্যই একটি মূল পদার্থের পরিণতি। যিনি চিত্তের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারেন, তিনি দেখেন অন্নের অর্থাৎ জড়ের মধ্যেই রক্ষিত আছে রস, রতি, বল, সম্ভোগ ও আনন্দ। সেই বিজ্ঞানময় সত্তা থেকে মনে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তার নিত্য অভ্যাসের ফলে আসে স্থায়ী আনন্দ। ব্যক্তির আত্মোন্নতির ক্ষেত্রে এটা যেমন প্রযোজ্য, বৃহৎ সামাজিক ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। আত্মোন্নত আনন্দময় পুরুষের বিজ্ঞানময় আনন্দ তখন বৃহৎ সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়। সেই বিজ্ঞানময় আনন্দ সিদ্ধ সঙ্কল্পরূপে বাস্তবায়িত হয়ে তখন ছড়িয়ে যায় সকলের মধ্যে। সমাজের সকল স্তরের বৈষম্য দূর হয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তার ও গতিময়তার সঙ্গে। সৎ ও চিৎ-এর ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে আনন্দ। এরই নাম সৎ-চিৎ-আনন্দ বা সচ্চিদানন্দ।

সমাজের সকল স্তরে বৈষম্য দূর করতে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কোনদিন ক্ষীণ হয়নি। তাতেই ছিল তাঁর 'আনন্দ'। 'সচ্চিদানন্দে' এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই শেষ জীবনে তিনি মানবতার আদর্শে মার্কসবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। শিবনারায়ণ স্বামী এবং রামদাস বাবাজীর শিষ্যদের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠস্থানীয় ছিলেন; ওঁরা দুজনেই মানবেন্দ্রনাথকে প্রধান শিষ্য করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ ওঁদের কাছে রাজযোগ এবং জ্ঞানযোগ শিক্ষা করেন দেশের এবং মানুষের মুক্তির সাধনায়। সেই সাধনায় তিনি মার্কস-এর দুটি মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি 'ব্যক্তি মানুষই

'সব কিছুর মাপকাঠি' এবং 'দর্শন মানে জগৎকে শুধু বিশ্লেষণ করা নয় তাকে পরিবর্তন করা' গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু স্বদেশভক্তি এবং জ্ঞানমার্গ তিনি কোনদিন পরিত্যাগ করেন নি। মানবেন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুই ভাব-ধারা আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করেছিল এই মানুষটির মধ্যে। তাই মানবেন্দ্রনাথ দার্শনিক এবং বিপ্লবী।

পরিশিষ্ট—১

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পর্কে তথ্যপত্র নং ৬৮৭

বেঙ্গল গভর্নমেন্টের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ সচিব, এল· এন· বার্ড কর্তৃক প্রস্তুত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১৯০৯ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ৩২৪

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামের প্রয়াত পণ্ডিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্যের পুত্র। ওঁর পিতার আদি বাস ছিল মেদিনীপুর জেলার মণ্ডলঘাট পরগণার ক্ষেপুত গ্রামে; এবং সেখানে ওঁর পূর্বপুরুষগণ একটি কালী মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন। দীনবন্ধু পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে ২৪ পরগণা জেলার বাদুরিয়া থানার আর-বেলিয়া গ্রামে প্রধান পণ্ডিতের কাজ নিয়ে চলে আসেন। পরে উনি ঐ জেলারই সোনারপুর থানার কোদালিয়া গ্রামে গিয়ে বাস করেন।

নরেন্দ্র ওঁর পিতার দ্বিতীয় পুত্র এবং ওঁর জন্ম হয় ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে। ওঁর রঙ ময়লা, মাঝারী গড়ন, লম্বা, সামান্য গোঁফ আছে, কিন্তু দাড়ি নাই; বড় বড় চোখ, পা'ও বেশ বড়, লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটেন, সোজা হয়ে দাঁড়ান; কথা বলার সময় ওপরের দাঁতগুলো দেখা যায়; উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি।

হরিনাভি স্কুলে নরেন্দ্র এন্ট্রেন্স ক্লাশ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তারপর কলকাতা ন্যাশন্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখান থেকে এন্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর আর পড়াশুনা করেননি। ন্যাশনাল কলেজে পড়বার সময় নরেন্দ্র অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে বাস করতেন, এবং ১৯০৮ সালে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হওয়ার পর নরেন্দ্র মুর্শিদাবাদ চলে যান।

ওঁর আত্মীয়-স্বজনের নাম নীচে দেওয়া হলো:

ভ্রাতা—সুষ্ঠুল (সুশীল) চন্দ্র ভট্টাচার্য, ইনি পুরীতে বেঙ্গল নাগপুর রেল-ওয়েতে বুকিং ক্লার্ক

কাকা বা মামা (uncle)—ননীচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতায় ১০নং শ্যামপুকুর লেনে থাকেন।

ভগিনীপতি—হরিদাস ভট্টাচার্য; ২০৪নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বসু এ্যান্ড কোং'র ডাক্তারখানায় চাকরী করেন।

সম্পর্কীয় ভ্রাতা—অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত আরবেলিয়া গ্রামের অধিবাসী। উনি মানিকতলার (বিপ্লবী) দলের সভ্য ছিলেন, এবং আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ২৩শে নভেম্বর সাত বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

নরেন্দ্র এবং তিনকাঁড় দাস ১৩নং ক্লাইভ স্ট্রীটে একটি ছোট্ট খাবারের দোকান চালান এবং ঐ থেকেই ওঁর যা রোজগার হয়। নরেন্দ্র সাধারণতঃ কলকাতার ১৩৫নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে থাকেন।

নরেন্দ্রর সহযোগীদের মধ্যে এঁরা আছেনঃ

১। ভূষণচন্দ্র মিত্র, বাস ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অধীন হরিনাভি। একজন গোয়েন্দা বিভাগের চর জানিয়েছে যে উনি একটি গুপ্ত সমিতির সভ্য। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ওঁকে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু উনি ছাড়া পান।

২। নৃপেন্দ্রনাথ বসু, বাস ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অধীন চাংড়িপোতা গ্রাম। কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য, বর্তমানে গোসাবায় (ক্যানিং থানা) চাকুরীরত।

৩। শৈলেন্দ্রনাথ (শৈলেশ্বর) বসু, বাস ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অধীন চাংড়িপোতা। চাংড়িপোতা রেল স্টেশনে ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে ওঁকে সন্দেহ করা হয়।

৪। তিনকড়ি দাস, ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অধীন মজিলপুর গ্রাম। নেত্রা ডাকাতিতে জড়িত ছিলেন বলে ওঁকে সন্দেহ করা হয়। একজন গোয়েন্দা বিভাগের চর উনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত বলে খবর দেয়। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় ওঁকে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু উনি ছাড়া পান।

কলকাতা ন্যাশনাল স্কুলে ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নিবাসী প্রভাসচন্দ্র দে দ্বারা (বিপ্লবী) জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হন। প্রভাস একজন নামকরা বিপ্লবী, এবং আলিপুর বোমার মামলা ও হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা—দুটি মামলাতেই রাজসাক্ষীরা ওঁর নামোল্লেখ করে বলে যে উনি গুপ্ত সমিতির সভ্য এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় হিংসাত্মক

কাজকর্মে লিপ্ত। চাংড়িপোতা ডাকাতি, যাতে নরেন্দ্র অভিযুক্ত হন এবং পুলিসের নজরে আসেন, সেটি ঐ গুপ্ত সমিতি দ্বারাই সংগঠিত হয়।

নরেন্দ্র কলকাতার 'আত্মোন্নতি সমিতি' এবং 'যুগান্তর' দলেরও সভ্য। আত্মোন্নতি সমিতি যখন প্রথম সংগঠিত হয় তখন এর উদ্দেশ্য ছিল শারীরিক শক্তির চর্চা, পরে এটি রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। এর সভ্যদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রনাথ নন্দী, যিনি 'যুগান্তর' এবং মানিকতলা দলের সভ্য ছিলেন এবং উপরুল্লিখিত প্রভাসচন্দ্র দে। 'যুগান্তর' দলের মধ্যেই সব থেকে দুর্ধর্ষ বিপ্লবীরা ছিলেন যাদের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজন মত টাকা-পয়সা ডাকাতি করে তোলা। এর অনেক সভ্যকেই বিদ্রোহ প্রচার করার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

বেঙ্গল ফাইল নং ৪-১২২২

কলিকাতা অনুশীলন সমিতি, নরেন্দ্র যার সভ্য ছিলেন, একটি দাতব্য পরোপকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। তাই, অনেকদিন যাবৎ এর সভ্যরা যে সব দুষ্কৃতকার্য করতো সেগুলি সেবা, দান-খয়রাত, দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য, অসুস্থদের শুশ্রূষা, মৃতদেহ দাহ করা, তীর্থ যাত্রীদের সাহায্য করা ইত্যাদির জন্য বোঝা যেত না। ৯১নং বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট নিবাসী সতীশচন্দ্র বসু কলিকাতা অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং উনি ওর সম্পাদকও ছিলেন। চাংড়িপোতা ডাকাতি থেকে প্রাপ্ত টাকা ওঁর হাতেই দেওয়া হয়েছিল। এবং পুলিশের কাছে যত লোক স্বীকারোক্তি করেছে তারা সকলেই বলেছে যে উনি খুব বিপজ্জনক চরিত্রের লোক। ১৯০৯ সালের ১২ই অক্টোবর সমিতিটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

পুলিশ ইন্সপেক্টর নরেন্দ্রকুমার মল্লিক, সাব-ইন্সপেক্টর বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং হেড কনস্টেবল সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী—এঁরা তিনজনেই নরেন্দ্রকে বেশ ভাল করে জানেন।

সম্প্রতি নরেন্দ্র আবার খুব কাজে নেমেছে, এবং ডাকাতির পরিকল্পনা করছে। ১৯১২ সালে অগাস্ট মাসে, ২৪ পরগণা পুলিশের জেলা সুপারিন্টেন্ডেন্ট একটি নোটে লিখেছেনঃ "ওঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক খবরাখবরের ভিত্তিতে ওঁকে বিপজ্জনক চরিত্রের লোক বলে চিহ্নিত করতে হবে।"

১৯০৭

১৯০৭ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ২০৫

ডিসেম্বর মাসে ইন্সপেক্টর টড যখন চিংড়িপোতা ডাকাতি সম্পর্কে খোঁজ

করতে কোদালিয়ার বাজারে যান, তখন দুজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী, হারাণ এবং উপেন্দ্রচন্দ্র চোল ওঁর কাছে নালিশ করেন যে পুজোর ৪/৫ দিন আগে হরিচন্দ্র এবং নরেন ভট্টাচার্য ওঁদের শাসিয়ে যান ওঁরা যেন বিলাতী কাপড়-চোপড় বিক্রী না করেন।

৬ই ডিসেম্বর তারিখে একটি ডাকাতের দল ২৪ পরগণা জেলায় চিংড়ি-পোতা রেল স্টেশনে ঢুকে রেলের কর্মচারীদের ভয় দেখিয়ে স্টেশনে যা টাকা-কড়ি ছিল দিয়ে দিতে বলে। ওরা লোহার সিন্দুক থেকে ৬৬৫ টাকা নিয়ে যায় এবং একজন রক্ষীকে আহত করে।

বুকিং ক্লার্ক রাজেন্দ্রলাল হালদার ডাকাতদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে চিনতে পারেন। তিনি বলেন নরেন্দ্রর হাতে একটি লাঠি ছিল এবং মুখ ঢাকা ছিল।

স্টেশন মাস্টার আরও বলেন যে, দিনের বেলায় নরেন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শৈলেন্দ্র (শৈলেশ্বর) বসু যখন ক্যাশ সিন্দুকে তোলা হয় তখন বুকিং অফিসে এসেছিলেন। নরেন্দ্রকে ৯ই ডিসেম্বর চিংড়িপোতা রেল স্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় নরেন্দ্র বলেন যে সেই সময় তিনি অন্যত্র ছিলেন। প্রশ্নোত্তরে নরেন বলেন তিনি ব্যারিস্টার এ· সি· ব্যানার্জী এবং যুগান্তর পত্রিকার কর্মচারীদের হয়ে কাজকর্ম করে রোজগার করেন। তাঁকে তল্লাসী করে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি পাওয়া যায়।

অবিনাশ ভট্টাচার্য রচিত যুদ্ধ-কৌশল সংক্রান্ত একটি রাজদ্রোহাত্মক পুস্তিকা, "বর্তমান রণনীতি"। অবিনাশ ভট্টাচার্য কলিকাতার বিপ্লবী দলের একজন সভ্য।

"মায়ের ডাক" লেখা একটি কাগজ (এখানে সংযোজন করা হইল)।

২৪ পরগণার কোদালিয়ায় এবং কলিকাতার ৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে নরেন্দ্রের বাসায় খানাতল্লাসী করা হয় কিন্তু সেরকম দোষণীয় কিছু পাওয়া যায় না।

ওঁকে বড় অঙ্কের জামীনে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং ১৯০৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী ওঁর বিরুদ্ধে বিশেষ তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় উনি মুক্তি পান।

১৯০৮

১৯০৮ সালের বেঙ্গল এ্যাবস্ট্রাকটের ১৯৬০(সি), ১১৫১(এফ) এবং ১২০৩(এম) প্যারাগ্রাফ হইতে উদ্ধৃতঃ

২৩শে মে সিদ্ধেশ্বর চ্যাটার্জী এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক সহ নরেন্দ্র মুর্শিদাবাদ জেলার বারওয়ান থানার অন্তর্গত পাঁচথুপি যান, সেখানে দুর্ভিক্ষ

দরুণ দুর্গতদের সাহায্য করতে এবং খাদ্য-দ্রব্যাদি বন্টন করেন। তারপর ওঁরা স্থানীয় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে যান এবং সেখানে সিদ্ধেশ্বর চ্যাটার্জী ছেলে-দের লাঠি খেলা শেখান।

বেঙ্গল ফাইল নং ১০৭৮

সোনারপুর থানার হরিনাভির অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য, বর্তমানে বেনারসে বসবাসকারী, হাওড়ার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষ্য দান করে' বলেন নরেন্দ্র বেনারসে গিয়েছিলেন এবং সেখানে গিদ্ধৌড়ের মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারীর বাড়ীতে ছিলেন। সেই সময় অম্বিকাবাবু নরেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু অকৃতকার্য হন।

স্টেটমেন্ট ৩-সি

মানিকতলা বোমার মামলার আসামীদের সাক্ষ্য থেকে নরেন্দ্র সম্পর্কে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়ঃ

"১৯-৩নং ছকু খানসামা লেনের বাড়ীটি অরবিন্দ ঘোষের জন্য ওঁর শ্বশুর ভাড়া নেন এবং তিনিই ভাড়া দিতেন। অরবিন্দ'র পরিবার সেখানে অল্প সময়ের জন্য ছিলেন, ১৯০৭ সালের ২৫ই নভেম্বর আমি ফিরে আসার আগে। আমি ওখানে গিয়ে এ'দের দেখতে পাইঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি আর কয়েকজনের সহযোগে চিংড়িপোতা রেল স্টেশনে ডাকাতি করে-ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র সেন মাঝে মাঝে আসতেন। নরেন্দ্র ৫/৬ বার মাত্র এসে-ছিলেন। একদিন নরেন্দ্র অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ডাকাতির টাকাটা রাখতে বলেন, কিন্তু অবিনাশ রাখতে রাজী হন না। অবিনাশ নরেনকে বলেন অনু-শীলন সমিতির সতীশ বসুর কাছে টাকাটা রেখে আসতে। নরেন সেই মত অনুশীলন সমিতির সতীশ বসুর কাছে টাকাটা রেখে আসেন। ঐ টাকার কিছুটা নরেন্দ্রর মামলায় খরচ হয়। নরেন্দ্র অবিনাশের আত্মীয়।"

স্টেটমেন্ট ৪-সি

"৪১নং চাঁপাতলায় 'যুগান্তর' মেসের দুটি অংশ ছিল; একটি ন্যাশনাল কলেজের ছাত্রাবাস আর অপরটি 'যুগান্তর' মেস। 'যুগান্তর' মেসে থাকতেন —নরেন্দ্র ভট্টাচার্য।"

১৯০৯

১৯০৯ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ২৩৯

নেত্রা ডাকাতির জন্য নরেন্দ্রকে ৩১শে মে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ-কারী সনাক্ত করতে না পারায় ৪ঠা জুন নরেন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯০৯ সালের ২৩শে এপ্রিল নেত্রা ডাকাতিটি ঘটে। অভিযোগকারী রামচন্দ্র মিত্র পুলিসের কাছে তাঁর অভিযোগে বলেন, একদল যুবক তাঁর বাড়ীতে ঢুকে জোর করে তাঁর কাছে সিন্দুকের চাবি আদায় করে। একজন তাঁর কপালে একটি রিভলবার উঁচিয়ে ধরেন। তারপর সিন্দুক খুলে নোট টাকা-পয়সা, গয়নাগাটি লুট করে। ওঁর স্ত্রীর হাত থেকে এক জোড়া সোনার বালাও ছিনিয়ে নেয়, এবং ওঁর পাশেই ওঁর ভাইয়ের বাড়ী থেকেও জিনিস-পত্র নিয়ে যায়। চলে যাবার আগে ওরা বলে যে ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য তারা এই টাকা-পয়সা নিয়ে যাচ্ছে. কারণ ওদের প্রয়োজন। কাজ হয়ে গেলে ওঁদের টাকা পয়সা ফেরৎ দিয়ে যাবে।

বেঙ্গল ফাইল নং ২০৭০

১৯০৯ সালে মে মাসে একজন গোয়েন্দা খবর দেয় যে নরেন্দ্র বেলুড় মঠে কিছুদিন ছিল কিন্তু ভাইয়ের বসন্ত হয়েছে তাঁকে সুশ্রূষা করতে হবে বলে হঠাৎ চলে যায়। এই সময় কৃষ্ণ আচার্য বলে একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সংগে ওঁকে খুব মেলামেশা করতে দেখা যায়। কৃষ্ণ আচার্য কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র এবং একজন ঘোরতর বিপ্লবী। কৃষ্ণ আচার্যর সংগে বেলুড় মঠেই নরেন্দ্রর পরিচয় হয়।

১৯০৯ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ৫০৫

জুলাই মাসে খবর পাওয়া গেছে যে ১২নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে নরেন্দ্র'র একটি লোহার ভোরঙ্গের দোকান আছে এবং সেখান থেকে প্রতিদিন ফরিদ-পুরের 'জাতীয় ভাণ্ডারে' তিনি যান। এই 'জাতীয় ভাণ্ডার' হচ্ছে ঢাকা এবং ফরিদপুরের সন্দেহচরিত্র যুবকদের আড্ডা।

১৯০৯ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ১০৯

১৪ই সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র এবং ভূষণ মিত্র কর্নেল নন্দীর বাড়ীতে সারদা-চরণ সেনের সংগে দেখা করেন। ১৯০৭ সালে দেশদ্রোহাত্মক পত্রিকা, 'সন্ধ্যা'র কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন সারদা সেন। সারদা এবং ঐ পত্রিকার মালিককে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৯১০

বেঙ্গল ফাইল নং ১০৭৮

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার একজন রাজসাক্ষীর জবানবন্দী অনুসারে ২০শে জানুয়ারী নরেন্দ্রর বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয়। খানাতল্লাসীতে এইসব

কাগজ-পত্র পাওয়া যায়ঃ অরবিন্দ ঘোষের ছবি, ১৪ কপি 'ধর্ম' পত্রিকা এবং ১৯ কপি 'কর্মযোগীন'। ১৯১০ সালের মার্চ এবং মে মাসে বাংলা সরকার বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩ এবং ১২৪ ধারায় হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করবার জন্য আদেশ দেন।

১৯১১

১৯১১ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ৮২০(ডি)

১৯শে এপ্রিল নরেন্দ্র হাইকোর্ট কর্তৃক মুক্তি পান। হাইকোর্টের রায় এই তথ্যপত্রের সঙ্গে পরিশিষ্ট 'খ' হিসাবে যুক্ত হইল।

জেল থেকে ছাড়া পাবার পর নরেন্দ্র কোদালিয়ায় যান।

মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে খবর পাওয়া যায় যে নরেন্দ্র নিয়মিত কলকাতা, কোদালিয়া এবং (সুন্দরবনের) গোসাবার মধ্যে যাতায়াত করেন। কিন্তু তার মধ্যে কোনরকম সন্দেহজনক কাজ-কর্মের খবর পাওয়া যায় না।

১৯১১ সালের বেঙ্গল এ্যাবস্ট্র্যাক্ট-এর ৪১০৩, ৪১০৪ এবং ৪১৮৩ প্যারাগ্রাফ

সেপ্টেম্বর মাসে গয়া পরিদর্শন করে নরেন্দ্র বেনারসে তীর্থযাত্রায় যান, সেখানে গঙ্গাস্নান করতে। ফিরে এসে ২৪ পরগণার মজিলপুরে রজনী ভট্টাচার্য এবং তিনকড়ি দাশের সঙ্গে দেখা করেন। এঁরা দুজনেই হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ছাড়া পেয়েছিলেন।

১৯১২

১৯১২ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ৮২০(বি)

৯ই ফেব্রুয়ারী একজন চর খবর দেয় যে নরেন্দ্র এবং তিনকড়ি দাশ ১১নং ক্লাইভ স্ট্রীটে একটি খাবারের দোকান খুলেছেন এবং চাংড়িপোতায় একটি ডাকাতি করবার পরিকল্পনা করছেন। সেজন্য ওঁদের ওপর কড়া নজর রাখা হয়, ফলে ডাকাতিটি আর হয় না।

১৯১২ সালের বেঙ্গল ফাইল নং ৮৪৫(ই)

এপ্রিল মাসে নরেন্দ্র কয়েকদিনের জন্য নারায়ণগঞ্জে যান, এবং কাজকর্ম সেরে ফিরে আসেন।

১৯১২ সালের বেঙ্গল এ্যাবস্ট্রাক্টের ৩৭১৬ প্যারাগ্রাফ

অক্টোবর মাসে খবর পাওয়া যায় নরেন্দ্র ৯১নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে বাস করছেন

স্বাক্ষর—এল· এন· বার্ড
গোয়েন্দা দপ্তরের বিশেষ সচিব
(১৯১২ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিবরণ)

পরিশিষ্ট—১(ক)

"মায়ের ডাক"

দেশের আজ ভয়ঙ্কর দুর্দিন; ব্রাহ্মণের কণ্ঠে বেদগান নাই, যোদ্ধার কণ্ঠে নাই জয়ধ্বনি। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের হাহাকারে আজীবন ব্যাধিগ্রস্ত হত-ভাগ্যের আর্তনাদে সমগ্র দেশ পরিপূর্ণ; অসন্তোষের বহ্নি সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি আজ শ্মশানভূমিতে পর্যবসিত, সেখানে ডাকিনী-যোগিনীবৃন্দ নৃত্যচঞ্চলা। বীরপ্রসবিনীর সন্তান সেখানে ভীত-সন্ত্রস্ত হৃদয়ে দিন কাটাইতেছে। আর্যভূমি দেবভূমি এই দেশ আজ বিধর্মী-দ্বারা অধ্যুষিত। যে গো-মাতা দেবতাদিগেরও পূজনীয়া, তাঁহাকে নিধন করা হইতেছে। ভারতীয় নারীর যে সতীত্বে আকাশ-ভুবন উদ্ভাসিত, তাহা আজ নিষ্ঠুরভাবে লুণ্ঠিত। দস্যুর অত্যাচারে মন্দির অপবিত্র হইতেছে, দেবমূর্তির ধ্বংস সাধিত হইতেছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ধর্ম নাই, কর্ম নাই—একে একে সকলি বিনষ্ট হইতেছে।

হে ভারতবাসী, আর কতকাল তোমরা বিনা-প্রতিবাদে দানবের অত্যাচার সহ্য করিবে? নীরবে ধর্মের নিন্দা শুনিতে থাকিবে? দেশবাসীর দুরবস্থা দেখিয়াও নির্বিকার থাকিবে? নিপীড়ন-সত্ত্বেও ঔদাস্যের সহিত সুখশয্যায় কালাতিপাত করিবে? এখনও বসিয়া থাকা কি মনুষ্যোচিত আচরণ? বন্য-পশুও শৃংখলাবদ্ধ হইলে মস্তক আন্দোলিত করে; পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীও চঞ্চুর আঘাতে পিঞ্জর ভঙ্গ করিতে সচেষ্ট হয়। আমরা কি পশুপক্ষীরও তুলনায় হীনতর?

আমাদের ধমনীতে আর্যরক্ত প্রবাহিত; দীন আমরা হইতে পারি, কিন্তু হীন কদাচ নই। আর্যদের কীর্তি স্মরণ কর; আর অবসাদগ্রস্ত থাকিও না—বীরগৌরবে অবতীর্ণ হও। জননীর ঋণ পরিশোধ কর, জননীর দুঃখ মোচন কর। কাণ পাতিয়া শোন, দিগন্ত ব্যাপিয়া রব উঠিতেছে—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত"।

দেশের দুরবস্থায় আজ অনেকেরই হৃদয় বিষাদগ্রস্ত; মহৎ দেশ-প্রেমিকদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে করুণ ক্রন্দনধ্বনি নির্গত হইতেছে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভাই, কাঁদিবার সময় কোথায়? কাঁদিয়া তো আমরা বহু-কাল কাটাইলাম, কাঁদিয়া কোনও লাভ নাই। কঠোর কর্তব্য তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হৃদয়ে শক্তি অনুভব কর, অমিতবিক্রমে কর্তব্যের পথে অগ্রসর হও। এই ভারতভূমি কর্মেরই ভূমি—কর্মযোগী ব্যতীত কাহারও এখানে স্থান নাই। মনে রাখিও—"আমরা কর্ম করিতে আসিয়াছি, কর্মই জীবের বৈশিষ্ট্য।"

নিপীড়নে-নির্যাতনে ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না। শত শত বাধাবিপত্তি, জয়-পরাজয়, মান-অপমানের আঘাত নগ্নবক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে।

দেবদেবীর লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ না করিলে বিবেকের জাগরণ ঘটিবে না; ধর্ম-হীন জীবনে পুণ্যসঞ্চয় সম্ভব নয়; দৈন্যপীড়িত মনে মহতী চেতনার উন্মেষ ঘটে না; সতীর আর্তনাদ না শুনিলে হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার হয় না; গোহত্যা প্রত্যক্ষ না করিলে অন্তরে প্রতিশোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না। এই কারণেই মায়ের এই বিচিত্র লীলার প্রকাশ। অত্যাচারের মাত্রা চরম না হইলে পরাধীন জাতি নবজীবনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় না—তাই জননীর এই বিস্ময়-কর কর্মকাণ্ডের অবতারণা।

ভারতভূমিতে অত্যাচারের মাত্রা আজ পূর্ণ হইয়াছে—আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই আজ নিপীড়িত। অত্যাচারীর ধ্বংস তাই আসন্ন। যাহারই দেহে বিন্দুমাত্র হিন্দুরক্ত বর্তমান, তাহারই হৃদয়ে আজ উদ্দীপনা সঞ্জাত হইবে; অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে সেই আজ জীবনপণ করিবে। তাই বলি—কাঁদিবার সময় নাই, ভাবিবার সময় নাই, বুঝিবার সময় নাই- অগ্রসর হও। কর্তব্য যতই দুঃসাধ্য হউক, জননীর দুঃখ দূরীকরণের জন্য আমরা তাহা সাধন করিব।

এই কর্তব্য কষ্টসাধ্য। এই কঠোর কর্তব্য পালন করিতে হইলে আত্ম-চিন্তা পরিহার করিতে হইবে, জননীর অভয়-চরণে স্বার্থবোধ উৎসর্গ করিতে হইবে। নিজের প্রতিটি কর্মকে জননীর কর্ম বলিয়া মনে করিতে হইবে, এবং জননীর প্রতিটি কার্যকে নিজের কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মায়ের মন্ত্রে যাহার দীক্ষা হইবে, তাহার মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী বা স্ত্রীপুত্র থাকিবে না। পবিত্র মাতৃমন্ত্রে যাহারা দীক্ষিত, তাহারাই শুধু তাঁহার আত্মীয় হিসাবে পরিগণিত হইবে।

আর কালক্ষেপ করিও না। জননীর দুঃখে যাহাদের প্রাণ কাঁদিতেছে, তাহারা সকলেই অগ্রসর হও—তোমাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, সারাজীবনেও এই কার্যের সমাপ্তি ঘটিবে না। যাহারা জননীর কার্যে আত্মোৎসর্গ করিবে, আত্মচিন্তা বিসর্জন দিবে, স্বার্থ-দ্বেষ-ঈর্ষা পরিত্যাগ করিবে, তাহারা সকলেই অগ্রসর হও। ঐ দেখ, বৈরীভয়নাশিনী সর্বদুঃখ-

হারিণী ভুবনমোহিনী জননী হাসিতে হাসিতে শত্রুকে পদতলে দলিত করিতে-ছেন! ভয় কী? তোমরা জননীর সন্তান, জননীর কার্যসাধনে ব্রতী। পৃথিবীতে এমন শক্তি কাহার, যে তোমাদের কর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে? অগ্রসর হও, নিঃশঙ্ক, দ্বিধাহীন চিত্তে সম্মুখপানে অগ্রসর হও। স্বয়ং অভয়ার অভয়চরণ আমাদের মস্তকে স্থাপিত—আমাদের আবার কাহাকে ভয়? ঐ দেখ, বিজয়পতাকাধারিণী মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বল ভাই, 'বন্দে মাতরম্'—ভূলোকে দ্যুলোকে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হউক, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হউক।*

* "মায়ের ডাক" পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে শ্রীসুশীল ভদ্র উদ্ধার করেন। সেটি ছিল মূল রচনার ইংরাজী অনুবাদ। সুশীল ভদ্র সেই ইংরেজী অনুবাদ থেকে "অশান্ত ব্রাহ্মণ"-এ সংযোজন করার জন্য বাঙলায় অনুবাদ করেছেন।

পরিশিষ্ট—১(খ)

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায়
নরেন ভট্টাচার্য সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ের অংশবিশেষ

চিংড়িপোতা দলের অন্যজন হলেন নরেন ভট্টাচার্য। ওঁকে চিংড়িপোতা ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত করা হয় কিন্তু ছাড়া পান। কাপড়ে স্ট্যাম্প দেবার ব্যাপারেও ওঁর নামে অভিযোগ ছিল এবং সে কাজটি যতই গর্হিত হয়ে থাকুক, বর্তমান মামলায় সেই অভিযোগটিকে প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে না। ললিত (রাজসাক্ষী) অবশ্য বলেছেন যে নরেন ষড়যন্ত্রকারীদের দলের সদস্য কিন্তু ঐ অভিযোগটি অত্যন্ত সাধারণ ধরণের। আমাদের সামনে তিনি বলেছেন যে নরেন নেত্রা ডাকাতিতে সংযুক্ত ছিলেন এবং সেখানেই উনি প্রথম নরেন ভট্টাচার্যকে দেখেন এবং জানতে পারেন যে নরেন গুপ্ত সমিতির সভ্য। ললিত কিন্তু তাঁর স্বীকারোক্তিতে বলেন নি যে নেত্রা ডাকাতিতে নরেন জড়িত ছিল। তিনি প্রথম ১৩ ডিসেম্বর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ওঁর নাম করেন। কিন্তু সারদাপ্রসাদ গাঙ্গুলী যখন ওঁকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যান তখন উনি নরেন ভট্টাচার্যকে সনাক্ত করতে অপারগ হন। ঠিক একই ভাবে ১৯১০ সালের ৯ই এপ্রিল মিঃ ডুভাই-এর সামনেও উনি সনাক্ত করতে অপারগ হয়েছিলেন। ১১ই এপ্রিল দায়রা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে যখন উনি সাক্ষ্য দেন তখনও, নরেনকে সামনে উপস্থিত করা হলে, উনি বলেন, "এখনও আমি নিশ্চিত নই যে এই লোকটি নেত্রা ডাকাতির সময় ছিল। চিংড়িপোতার নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলে একজন ওখানে ছিলেন বলে শুনেছিলুম"। সুতরাং নেত্রা ডাকাতিতে যে নরেন যুক্ত ছিলেন ললিতের সাক্ষ্য থেকে তা প্রমাণ হয় না। কিন্তু নেত্রা ডাকাতির সঙ্গে নরেন জড়িত ছিলেন এই ধারণার বশেই তিনি মনে করতেন যে নরেন এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত। তাই এই অভিযোগের কোন সত্যকার ভিত্তি নেই। এখানে আর একটা জিনিসও বলা দরকার যে নরেনের বিরুদ্ধে ললিতের সাক্ষ্য অন্য কেউ সমর্থন করেনি। নরেন ভট্টাচার্যের বেনারস যাওয়ার ব্যাপারটাকেও বাদীপক্ষ ওঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে বলছেন না। সম্ভবত বিবাহের সম্বন্ধের ব্যাপারেই নরেন

বেনারস গিয়ে থাকবেন। নরেনের বাড়ী খানাতল্লাসী করেও কিছু পাওয়া যায় নি; তবে চিংড়িপোতা ডাকাতির ব্যাপারে গ্রেপ্তারের সময় ওঁর কাছে এক কপি 'বর্তমান রণনীতি' এবং 'মায়ের ডাক' শিরোনামায় একটি রচনার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। 'বর্তমান রণনীতি' তখন সদ্য প্রকাশিত এবং সম্ভবত বইটির চাহিদাও তখন খুব বেশী, সুতরাং ঐ বইটি থাকলেই যে কেউ ষড়যন্ত্রকারী-দের মধ্যে একজন এটা প্রমাণিত হয় না। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিটিও এই অভিযোগ প্রমাণ করে না। তাছাড়া, ঐ পাণ্ডুলিপিটি কোর্টকে দেখানোও হয়নি এবং সেটি যে নরেনেরই হাতে লেখা তাও বলা হয়নি। সুতরাং আমার মতে নরেন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলাটি টেঁকে না।

পরিশিষ্ট—২

নরেনের স্মৃতি

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নরেনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতার শুরু হয় বহুকাল আগে—তখন তার নাম এম· এন· রায় হয় নি। অবচেতনের গভীর থেকে অগ্নিযুগের সকল স্মৃতি উদ্ধার করা আজ দুঃসাধ্য। লিখে রাখাও সম্ভব হয় নি কিছু—ডায়েরি রাখা বিপ্লবীদের পক্ষে আচরণসম্মত ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানরা ভারতীয় বিপ্লবীদের একটা প্রতিশ্রুতি দেয়ঃ ইংরেজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তারা অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দেবে। প্রতিশ্রুত অস্ত্র আনবার ব্যবস্থা করবার জন্য নরেনকে বিদেশে পাঠানো হয়। তার আগে দু'বার মাত্র ওর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। ততদিনে অবশ্য ওর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। বালেশ্বরের বীর যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে যে সব বিপ্লবী সংঘবদ্ধ হয়েছিল, তাদের মধ্যে নরেনই ছিল সবচেয়ে নির্ভীক।

বিপ্লবীদের অনেকেই তখন নানান্ ধরনের 'দোকান' দিয়েছিলেন। দোকানগুলি মুখ্যত ছিল যোগাযোগকেন্দ্র, তবে ঠাট বজায় রাখবার জন্য সত্যিকার দোকানদারিরও কিছুটা ব্যবস্থা ছিল। আমারও এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল হ্যারিসন রোডের উপরে—শ্রমজীবী সমবায়। সেখানেই নরেনের সাথে আমার প্রথম পরিচয়। নরেন তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ। যতীনই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। নরেনের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ। এমন কথাও বললেন যে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র পেলে নরেনের মতো শ'খানেক ছেলেই দুনিয়ার চেহারা পালটে দিতে পারে।

অর্থাৎ, নরেনের মতো দক্ষ মুক্তিসৈনিক চাই, যথেষ্ট সংখ্যায়। এবং সেই সঙ্গে চাই যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র। কোনওটাই আমাদের আয়ত্তে ছিল না।

আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আমি একজন। সাধারণ কর্মীদের আমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করা নিষিদ্ধ ছিল। আমার দায়িত্ব ছিল সরবরাহের

—বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদের মারফত টাকা পয়সার, কখনও কখনও অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দেওয়া ছিল আমার কাজ।

জার্মানদের সঙ্গে কথাবার্তা যখন পাকা হল—অথবা বলা যায়, পাকা হয়েছে বলে মনে হল—তখন কয়েকটা নির্ভরযোগ্য ঠিকানার দরকার হল। যে সব জায়গা নির্বাচিত হল তার মধ্যে শ্রমজীবী সমবায় একটি—নরেন এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে পত্রালাপ করবে।

নরেন জাভায় গেল, কিন্তু অস্ত্রের ব্যাপারে খুব একটা সুবিধে না হওয়ায় ফিরে এল। তবে একেবারে খালি হাতে আসে নি—জার্মানরা কিছু টাকা দিয়েছিল। নরেন সে টাকা দলের তহবিলে জমা দিয়েছিল। হাজার কয়েক টাকার একটা ব্যাংক ড্রাফট্ ছিল তার মধ্যে—এলাহাবাদ ব্যাংকের উপর। ড্রাফট্টা ভাঙাবার ভার দেওয়া হল আমাকে।

কাজটা খুব সহজ ছিল না। ততদিনে গভর্নমেন্ট আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে—জনা ছয়েক পুলিশ, দুজন ইন্‌ফর্মার এবং কয়েকজন সাব-ইন্সপেক্টর শ্রমজীবী সমবায়ের উপর সব সময় নজর রাখছে। আমি যেখানেই যাই সেখানেই তারা পিছু নেয়। এই কাজে ওরা এক মুহূর্তের জন্যও ঢিলে দিত না। আমার একান্ত ব্যক্তিগত কাজেও ওরা কাঁঠালের আঠার মতো আমার সঙ্গে লেগে থাকত। সে এক বিষম বিড়ম্বনা।

শ্রমজীবী সমবায়ের লেনদেন ছিল হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ব্যাংকের সঙ্গে, আর নরেনের আনা ড্রাফট ভাঙাতে হবে এলাহাবাদ ব্যাংকে। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভে আমি রোজই যাতায়াত করতুম, অবশ্যই সঙ্গে ফেউ থাকতো। নরেনের আনা ড্রাফট্ ভাঙানোর কাজটা সারতে হবে সরকারের নজর এড়িয়ে, সঙ্গে ফেউ থাকলে চলবে না। ঐটুকু সময়ের জন্য আমার নিত্যসঙ্গীদের সাহচর্য থেকে নিষ্কৃতি চাই। একটা ফন্দি আঁটতে হল।

পাহারাদাররা প্রায়ই আমাকে অনুরোধ করত—আমি যেন মাঝে মাঝে লম্বা-মাপের জার্নি করি—দক্ষিণ ভারত, বেনারস প্রভৃতি। ওরা তাহলে মোটা অঙ্কের ট্রাভেলিং অ্যালাওয়্যান্স পাবে। ছোট বড় সকল সরকারি চাকুরেরই এই ব্যাপারে কিছুটা দুর্বলতা থাকে—এখনও আছে, তখনও ছিল। ওদের এই দুর্বলতাকে আমি কাজে লাগালাম। একদিন ব্যাংকে যাবার পথে কথাচ্ছলে বললাম যে দু'এক দিনের মধ্যেই বেনারস যাব ঠিক করেছি, ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী হিসেবে। বলা বাহুল্য, ওদের চোখেমুখে খুশীর আমেজ ফুটে বেরুল।

তখন গ্রীষ্মকাল—আমের সময়। বড়বাজারে পেঁছে আমি দ্বিতীয় চাল চাললাম। প্রস্তাব দিলাম—সকলে মিলে কিছু আমের সদ্গতি করা যাক্। টোপ্টা ওরা গিলল, আগ্রহের সঙ্গেই রাজি হল। একজন আমওয়ালাকে

দশটাকা অগ্রিম দিলাম আমি—'বাবু'দের পেট ভরে আম খাওয়াতে বললাম। 'বাবু'দের বললাম—ব্যাংকের কাজটা চটপট সেরে এসে আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দেব। এইভাবে ওদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল, ওদের অগোচরে এলাহাবাদ ব্যাংক থেকে ড্রাফট্ ভাঙাবার সুযোগ মিলল। অতি সহজেই কার্যোদ্ধার হল। দলের অর্থবিভাগের দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁর কাছে টাকাটা পেঁাছে দেওয়া গেল।

এই ড্রাফট্ ভাঙানোর ব্যাপারটা নিয়ে সি· আই· ডি· বিস্তর অনুসন্ধান চালিয়েছিল, কিন্তু কীভাবে কী ঘটেছিল তা কোনওদিনই বুঝতে পারে নি।

পাথুরিয়াঘাটার ঘটনার পরে যতীন মুখোপাধ্যায় আত্মগোপন করলেন, কলকাতার বাইরে চলে গেলেন। লোক মারফৎ আমাকে অনুরোধ জানালেন—নরেনের জন্য যেন বিদেশে যাওয়ার উপযুক্ত কিছু পোশাকের ব্যবস্থা করি—অস্ত্রের সন্ধানে নরেন জাভা, চীন এবং জাপানে যাবে।

আমার মাস্টার-টেলার সারদাপ্রসাদ দত্ত একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, আমার সম্পূর্ণ আস্থাভাজন। সময় মতোই তিনি নরেনের জন্য কয়েকপ্রস্থ স্যুট বানিয়ে দিলেন। নিজেই সেগুলো নরেনের হাতে পেঁাছে দেবার সিদ্ধান্ত নিলাম—ওর গোপন আস্তানাটা ছিল কাছেই। আত্মগোপনকারী আরও কয়েকজন সেখানে ওর সঙ্গে থাকত।

বেশ কিছুটা ঝুঁকির ব্যাপার সন্দেহ নেই। পুলিশ আগের মতোই সদা-সতর্ক; ওদের চোখকে ফাঁকি দিতে হবে। ওদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আবার জুটেছে একজন সারজেণ্ট—সব সময় রিভলভার উঁচিয়ে দোকানের সামনে বসে থাকে। রীতিমতো কৌতুককর দৃশ্য।

আবার কিছুটা বুদ্ধি খেলিয়ে ওদের নজর এড়ানো গেল—নিরাপদেই নরেনের ডেরায় পেঁাছে গেলাম। পুরোদস্তুর সাহেবি পোযাক পরে নরেন আমার সামনে দাঁড়াল। আধঘন্টাখানেক ধরে আমরা কথাবার্তা কইলাম। বিদায়ের সময় নরেন আমার পায়ের ধুলো নিল।

তখনকর মতো সেই আমাদের শেষ দেখা। আবার দেখা হয়েছিল অনেক-কাল পরে, ১৯৩৭ সালে। নরেন তখন এম· এন· রায়।

নরেন সম্বন্ধে যতীন আমাকে অনেক কিছুই জানিয়েছিলেন। নরেন অজ্ঞাবাদী, ধর্মীয় মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী; কিন্তু অনেক সদ্‌গুণেরও অধিকারী। দেশে হোক, বিদেশে হোক, সর্বত্র সে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করবে, নেতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে। দেখতে নিতান্ত ভালমানুষ, কিন্তু দুঃসাহসিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে সর্বদাই আগ্রহী, সর্বদাই প্রস্তুত।

পরবর্তীকালে নরেন তার ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। লিখে গিয়েছে অজস্র পুস্তক, কিছু কিছু স্মৃতিকথা। উত্তরসূরীদের জন্য একটি দর্শনেরও প্রবর্তন করে গিয়েছে।

কর্মরত অবস্থায়ই নরেন দুর্ঘটনার শিকার হল, আমরা তাকে হারালাম। কিন্তু মৃত্যু তাকে নিঃশেষ করতে পারে নি। মানুষের অনুপ্রেরণার চিরন্তন উৎস হিসেবে তার জীবন ও তার কীর্তি আমাদের মূল্যবান উত্তরাধিকার।

পরিশিষ্ট—৩

বিপ্লবীদের বিভিন্ন দল

হুগলি গ্রুপঃ ভূদেব, হেমচন্দ্র, বঙ্কিম, নবীন ও যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের দেশাত্মবোধ প্রচারের উত্তরাধিকারী এবং ব্রহ্মবান্ধব ও সতীশ মুখোপাধ্যায়ের উপদেশ-পুষ্ট হুগলি-গ্রুপ ১৯০৩ সাল হইতে বিদ্রোহের প্রচারকার্য আরম্ভ করেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল মায়াবতী হইতে ফিরিয়া আসিয়া হুগলিতে একটি গোপন বৈঠক করেন। সেখানে অরবিন্দ'র নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র ও বাংলার যে সংযুক্ত-দল গঠিত হয় তাহার বিবরণ দেন। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বড়াল (পরে আনন্দ আচার্য), সূর্য মুখোপাধ্যায়, যতীন মজুমদার, রাখাল ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। 'গোন্দলপাড়া সমিতি'তে উপেনবাবু ছাড়া প্রফেসর চারু রায়, শরৎ মুখোপাধ্যায় (পরে সিউড়ির ডাক্তার) প্রভৃতি অগ্রণী ছিলেন। চুঁচুড়ার পবিত্র দত্ত কলিকাতায় 'ছাত্র সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠিত করেন ও চুঁচুড়ায় কলেজের সম্মুখে 'সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়; কবিরাজবাটী ও মণ্ডলবাটীর যুবকেরা অগ্রণী ছিলেন। ১৯০৫-এ বঙ্গ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হুগলিতে 'সমিতি', শ্রমজীবী নৈশ-বিদ্যালয় ও জাতীয় ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে সমিতি ও নৈশ-বিদ্যালয় কয়েক বৎসর বাঁচিয়া থাকে। হুগলির 'সমিতি'র সঙ্গে শ্রীরামপুরের আশু দাস ও সতীশ সেন যুক্ত ছিলেন। যতীন মুখোপাধ্যায় পারিবারিক পরিচয়-সম্পর্কে হুগলিতে ভূপতি মজুমদারদের বাড়িতে আসিতেন। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বিদ্রোহের প্রস্তুতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বড়াল। হুগলি-সমিতিতে প্রথমে একটি রিভলভার, কয়েকটি ছোরা ও দুইখানি তরবারি সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রতি রবিবার শ্রীরামপুরে গোলাম মার্তাজা সাহেবের নিকট ছোরা ও তরবারিতে শিক্ষা লওয়া হইত। সপ্তাহে দুইদিন চাতরার ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গদকা ও ছোরা সম্বন্ধে হুগলিতে শিক্ষা দিতেন। 'সমিতি'তে তারাদাদা (ভবতারণ সাংখ্যরত্ন) ও তারা ক্ষ্যাপা সাংখ্য, গীতা ও চণ্ডী পড়াইতেন। তারা ক্ষ্যাপা মাঝে মাঝে খোলাখুলিভাবে যুবক ও কিশোর-

দের বিদ্রোহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেন। সুরেনবাবু 'সমিতি'র বাছাই-করা কয়েকজনকে ত্রিবেণীর উত্তরে নওয়াসরাই কাপিলাশ্রমে শ্রীমৎ হরিহরানন্দ আরণ্যর কাছে সাংখ্য-আলোচনার জন্য লইয়া যাইতেন।

১৯০৫ হইতে অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ 'সমিতি'তে আসিতেন। অধ্যাপক বিনয় সরকার, বিপিন গাঙ্গুলী, ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী, আশু দাস, দেবেন্দ্র মণ্ডল প্রভৃতি সমিতি পরিদর্শন করিতে আসিতেন। ১৯০৭-এ ত্রিবেণীতে অর্ধোদয় যোগের সময় চন্দননগর, হুগলি, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া ও গঙ্গার অপর পারের হালিশহর, নৈহাটী, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের বহুশত যুবক স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেন। হুগলি সমিতি ঐ সময় প্রতি বৎসর মাহেশের রথে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিতেন এবং রুট-মার্চ অভ্যাস করিতেন। ১৯০৭ সালে কাঁঠালপাড়ায় 'বঙ্কিম উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। বহুশত যুবক একত্রিত হইয়া 'মক-ফাইট' করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বঙ্কিমের বাটিতে 'মহেন্দ্রের দীক্ষা (আনন্দমঠ)' দেখানো হয়। এইসব অনুষ্ঠানে সামরিক কুচকাওয়াজের পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয়। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের সহকর্মী ও বন্ধু—উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদেশের নেতৃবর্গের সহিত মিলিত থাকিলেও স্থানীয় যুবকদের বিপ্লবী-দলে টানিতেন। হুগলি জেলার (চন্দননগর বাদে) বিপ্লবী-দল-সংগঠনে আশু দাস, সতীশ সেন ও সুরেন্দ্রনাথ বড়াল মিলিতভাবে কার্য করিতেন; চন্দননগরের সঙ্গে যোগাযোগ আশু দাসের মাধ্যমে রক্ষিত হইত।

১৯১৩ সালে বর্ধমানের বন্যায় কার্য করিবার সময় হইতে চন্দননগরের মতিবাবুর দলের সহিত হুগলি-জেলার সমিতিগুলির পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। সুরেন্দ্রনাথ বড়াল 'যুগান্তর'-এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি দেশত্যাগ করিয়া প্রথমে কিছুদিন ইংলণ্ডে অবস্থান করেন, তারপর নরওয়ে চলিয়া যান এবং সেখানে তুষারাবৃত পাহাড়ে 'গৌরীশঙ্কর মঠ' স্থাপন করেন এবং হিন্দুদর্শনের বহুলাংশ নরওয়ে ভাষায় অনুবাদ করেন। চন্দননগর-বিপ্লবী-দলের একদিকে গোন্দলপাড়ার বসন্তবাবু, নরেনবাবু প্রভৃতি বিপ্লবের কার্য চালাইতে থাকেন, আর একদিকে মতিবাবু তাঁহার দলবল লইয়া কার্য করিতে থাকেন। রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ, মণীন্দ্র নায়েক প্রভৃতি একত্র কার্য করিতেন। বাংলার বহু আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মীকে মতিবাবুদের শরণাপন্ন হইতে হইত।

উত্তরবঙ্গ গ্রুপ: মালদহে, রংপুরে, দিনাজপুরে, কুচবিহারে, রাজশাহীতে, বগুড়ায় ও পাবনায় ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হইলেও, তাঁহারা পরস্পরের সহযোগিতায় উত্তরবঙ্গ-গ্রুপ গঠন করেন। আই. সি. এস. চারু দত্ত বোম্বাই প্রদেশে অরবিন্দের নির্দেশমতো চলিতেন। তাঁহার লিখিত 'পুরানো কথা

(উপসংহারে)' ঐ সময়ের কার্যপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ঈশান চক্রবর্তী মহাশয় ও পুত্রেরা (প্রফুল্লচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র), অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র রায়, সতীশ সরকার, প্রফুল্ল চাকী, কালী বাগচী, বিজয় রায়চৌধুরী, কৃষ্ণজীবন সান্যাল ও আরও অনেকে বিদ্রোহ-পন্থী ছিলেন। মালদহের বিপিন ঘোষ, বিনয় সরকার প্রভৃতি শিক্ষা ও স্বদেশী প্রচারকার্য লইয়া থাকিতেন। ঐ সময় মালদহে টারগেট-প্রাকটিশের জন্য ব্যবস্থা ছিল; রাজেন চৌধুরী, খগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, বাণেশ্বর দাস, সুরাজ লাহিড়ী, বলদেবানন্দ গিরি ইঁহারা ও কানাই মৈত্র এই দলে ছিলেন। ১৯০৩-০৪ সাল হইতে পাবনার অবিনাশচন্দ্র রায় ও জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় সারা উত্তরবঙ্গে বিপ্লব-কেন্দ্র গঠন করিয়া বেড়াইতেন। অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী মুনসেফ থাকাকালীনও কলিকাতায় 'অনুশীলন' নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে কার্য করিতেন। যতীনদা (যতীন্দ্রনাথ রায়) নদীয়া হইতে বাল্যকালে বগুড়ায় যান এবং চরিত্রগুণে বহু যুবককে দেশসাধনায় দীক্ষিত করেন। যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত বরাবর তাঁহার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী পি· মিত্রের সহযোগী ও 'অনুশীলন'-এর কার্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন।

মাদারিপুর গ্রুপ: পূর্ণ দাসের নেতৃত্বে এই দলটি গঠিত হইয়াছিল। এই দলের অনেকে বহু কার্যে বিপদ বরণ করেন এবং মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, নীরেন দাসগুপ্ত ও চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'বালেশ্বর যুদ্ধে' আত্মদান করেন। গার্ডেনরীচ মামলায় রাধাচরণ প্রামাণিক নিজ স্কন্ধে দোষ লইয়া নরেন ভট্টাচার্যকে (এম· এন· রায়) জামিনে ছাড়া পাইবার সুযোগ করিয়া দেন। পুলিন দাসের কারাদণ্ডের পর প্রফুল্ল চৌধুরী, যতীন চ্যাটার্জী ও রসিক সরকার সদলবলে পূর্ণ দাসের সঙ্গে মিলিত হন। রসিক সরকার পরে জেলে আত্মহত্যা করেন। মাদারিপুরের কালীপ্রসন্ন বন্দ্যো-পাধ্যায়, বামন চক্রবর্তী, প্রতাপ গুহ রায় এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিজয় চক্রবর্তী, কুলরঞ্জন মুখার্জী, কালীপদ রায়চৌধুরী, সুরেশ রায়চৌধুরী, সন্তোষ দত্ত, সুরেন সাহা, আশু দাস, বীরেন চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

যশোহর-খুলনা গ্রুপ: কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরাজ বিজয় রায়, নলডাঙার দেব রায়, বিনোদপুরের হেমন্ত মজুমদার, সতীশ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্র দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী, চারু ঘোষ, অমরেশ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি প্রথম যুগ হইতে আজীবন বিপ্লববাদ-প্রচার ও সংগঠন-কেন্দ্র-স্থাপনার কার্য করিয়াছেন। ১৯০৬-১০ সাল অবধি খ্যাতনামা ছিলেন শচীন মিত্র, বিধুভূষণ দে, অবনী চক্রবর্তী ও সুধীরকুমার দে। খুলনায় ষড়যন্ত্রের মামলা হয়। সুধীর

সরকার আলিপুর বোমার মামলার আসামী ছিলেন। চারু বসু চরম আত্মদান করেন।

দক্ষিণ ২৪-পরগণার গ্রুপঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (পরে এম· এন· রায়), হরিকুমার চক্রবর্তী, ফণী চক্রবর্তী ও তাঁহার দুই ভাই, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর বসু ও ভ্রাতৃগণ, অলোক চক্রবর্তী, কালীচরণ ঘোষ—ইঁহারা নারিকেলডাঙা, বেহালা ও খিদিরপুরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া একটি বড় দল গঠন করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে ও 'অনুশীলন'-এর নেতাদের সঙ্গে ইঁহাদের নিবিড় সংযোগ হয়। ইঁহারা সকলেই ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সময় হইতেই এখানে চিন্তা ও কর্মের প্রচণ্ড উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

বরিশাল গ্রুপঃ বরিশাল, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রথমে একসঙ্গে কার্য করিতেন। ইহাদের সেদিনের একটি 'দল' বলা যাইতে পারে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ছিলেন ইহার কেন্দ্র। নরেন্দ্র ঘোষ চৌধুরী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুরেশ চট্টোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন গুহ রায়, অরুণচন্দ্র গুহ, অবলা কর, সতীন সেন, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, শ্রীহট্টের অনেকে, কুমিল্লার বসন্ত মজুমদার প্রভৃতি একত্রে দল গঠন করেন। প্রজ্ঞানানন্দ বাংলার বহু বিপ্লবীর শিক্ষাদাতা ও নির্দেশদাতা ছিলেন। বরিশালের শঙ্কর-মঠের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই ইহার ভক্ত ছিলেন। কলিকাতায় কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'প্রজ্ঞানানন্দ পাঠাগার' স্থাপন করিয়া এই সন্ন্যাসী মুক্তিসাধকের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন।

ঢাকার হেমবাবুর গ্রুপঃ হেম ঘোষ ও হরিদাস দত্ত (বড়দা ও মেজদা) যে দল গঠন করেন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে সেই দলের দান অপরিসীম। হেমবাবুর দলে উচ্চশিক্ষায়, ব্যায়াম-চর্চায়, সংস্কৃতিতে ও ললিতকলায় অগ্রণী বহু যুবক যোগদান করেন। বিপিন গাঙ্গুলী ও যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত হেমবাবু, সুরেন বর্ধন, শ্রীশ পাল ও আরও কয়েকজনের মাধ্যমে ইহাদের সহযোগিতা ছিল। দেশে 'হোয়াইট-লাইফ ফরফিট' এই মত গৃহীত হইবার পর ঢাকায় লোম্যান ও হড্সনকে চরম শাস্তি দেওয়া হয়। বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত এবং মেদিনীপুরে একটির পর একটি তিনটি ম্যাজিস্ট্রেটকে, ইংরেজের নৃশংসতা ও বর্বরতার প্রতিশোধ হিসাবে—ইহারা মৃত্যুদণ্ড দেন। এই সময়ে ইহারা বি· ভি· (B. V.) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেবং আক্রমণ ও ঢাকায় মেদিনীপুরে অনেকের আন্দামানে দ্বীপান্তর হইয়াছিল। অনিল রায়, লীলা নাগ (পরে রায়) এই গ্রুপ হইতে বাহির হইয়া শক্তিশালী 'শ্রীসঙ্ঘ' গঠিত করেন।

ময়মনসিংহ গ্রুপঃ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, আনন্দ মজুমদার, মণি চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, ক্ষিতীশ চৌধুরী, নগেন চক্রবর্তী, সতীশ ঠাকুর ও মংলা (দুর্গাপ্রসন্ন) দাশগুপ্ত ময়মনসিংহ জেলার বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করেন। ঢাকা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট ও উত্তর-বঙ্গের কয়েক স্থানে ইঁহাদের শাখা গঠিত হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট গ্রুপঃ স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া হইতেই শ্রীহট্টের বহু মনীষী বিপ্লবের মনোভাব সৃষ্টি করেন। বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্মিতা বাংলা তথা ভারতকে সংগ্রামের পথনির্দেশ দেয়। হেম সেন ও তাঁহার ভ্রাতারা, শ্রীশ দত্ত, বসন্ত দাস, জ্ঞান ধর, দেবেন চৌধুরী প্রভৃতির নাম সব সময়ে স্মরণে আসে। সুশীল সেনের বেত্রাঘাতের ফলে কিংসফোর্ড-এর জীবননাশের চেষ্টা হইতেই অমরবীর ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মদান সংঘটিত হয়। হেম সেন ও বীরেন সেন বোমার-মামলায় দণ্ডভোগ করেন। বিপ্লবের প্রস্তুতির এক পর্যায়ে সুশীল সেনের জীবনাবসান ঘটে।

চট্টগ্রাম গ্রুপঃ প্রথমে চট্টগ্রামের সঙ্গে নোয়াখালি ও বরিশালের কিছু সম্পর্ক ছিল; পরে বহরমপুরে সূর্য সেনের সহিত 'যুগান্তর' দলের পরিচয় ঘটে। তাহার পরের যে কাহিনী তাহা ইতিহাসের পর্যায়ে এখনও লিখিত হয় নাই। চট্টগ্রামের বীরদের আত্মদান কাহিনী বাংলায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। হরিকুমার চক্রবর্তী, হেম ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, ভূপেন্দ্র রক্ষিত রায় প্রভৃতিকে লইয়া অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেনের মাধ্যমে ভূপেন্দ্র দত্ত চট্টগ্রামের সহিত বিদ্রোহ-প্রস্তুতির যোগাযোগ রক্ষা করিতেন।